মেয়েদের নিজস্ব পত্রিকা

সুকন্যা

১/১৬ – ৩১ ডিসেম্বর ১৯৮৮





পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ও স্ক্যান ঃ অরূপ রাউত

এডিট ঃ স্নেহময় বিশ্বাস

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com



এখন হরলিক্স
অতিরিক্ত ক্যালসিয়াম সহ
Great Nourisher
"বাড়ন্ত
বাচ্চাদের
দরকার
বাড়তি ক্যালসিয়াম।"
হরলিক্স এখন অতিরিক্ত ক্যালসিয়ামে সমৃদ্ধ – বাড়ন্ত বাচ্চাদের শক্ত দাঁত আর মজবুত হাড়ের জন্য এবং পুরো পরিবারের সুস্বাস্থ্যের জন্য যা অত্যন্ত জরুরী।
হরলিক্স প্রাকৃতিক সব প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানে ভরপুর – প্রোটিন, ভিটামিন্স, মিনারেল্স ও কার্বোহাইড্রেট্স যা দেয় শক্তি, উদ্যম ও সজীবতা। আর এখন অতিরিক্ত ক্যালসিয়াম অর্থ সম্পূর্ণ সুস্বাস্থ্য।
পুষ্টি যোগাতে অদ্বিতীয়
Horlicks
WITH EXTRA CALCIUM
HORLICKS
The Great Nourisher
HTA 6037BEN

সংরক্ষণ না সংঘাত ?

সম্প্রতি ভারতের প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, সরকারি চাকরিতে ত্রিশ শতাংশ আসন মেয়েদের জন্য সংরক্ষিত হওয়া উচিত। নিঃসন্দেহে চমকপ্রদ প্রস্তাব। আপাতবিচারে একে নারীকল্যাণ কর্মসূচীর সর্বোত্তম প্রকল্প বলেও মনে হতে পারে। কিন্তু সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে অন্য সত্য ধরা দেয়। সরকারি চাকরিতে তপশীলী সম্প্রদায় কিংবা উপজাতিভুক্ত ভারতীয় নাগরিকদের আসন সংরক্ষণ ও অন্যান্য সুবিধাদানের ব্যবস্থা দীর্ঘদিন যাবৎ প্রচলিত আছে। কিন্তু এর ফলে ভারতের অনুন্নত অনগ্রসর শ্রেণীর নাগরিকদের সত্যিই কি সামগ্রিক কল্যাণ সাধিত হয়েছে বরং এদেশের ভয়াবহ বেকারত্বের আবহাওয়ায় চাকরি ক্ষেত্রে এই বৈষম্যকে কেন্দ্র করে অন্য আরেক শ্রেণীর মধ্যে ক্রমাগত পুঞ্জীভূত হচ্ছে ক্ষোভ আর বিদ্বেষ। সুতরাং এরপর মেয়েদের জন্য ত্রিশ শতাংশ আসন সংরক্ষিত হলে পরিস্থিতি কতটা প্রতিকূল পর্যায়ে পৌঁছবে, তা সহজেই অনুমেয়। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই, আজও এদেশে একটি মেয়ের তুলনায় একটি ছেলের চাকরি অনেক বেশি প্রয়োজনীয়। কারণ, উপার্জনশীল ছেলে বেকার মেয়ের দায়িত্ব নিতে মানসিকভাবে প্রস্তুত, যে প্রস্তুতি উপার্জনশীলা মেয়েদের ক্ষেত্রে থাকে না। চাকরিজীবী মেয়েরা সাধারণভাবে তাঁদের সমকক্ষ কিংবা উচ্চতর যোগ্যতার পুরুষকেই স্বামী হিসেবে পেতে চান। সুতরাং আমাদের বর্তমান সামাজিক কাঠামোয় চাকরিক্ষেত্রে মেয়েদের তুলনায় পুরুষের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিতেই হবে।

প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাব প্রসংগে আরেকটি প্রশ্ন অনিবার্যভাবে এসে পড়ে, এভাবে কি সত্যিই নারী কল্যাণ সম্ভব যে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ নারীসমাজের বাস গ্রামে, নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের জীবনে প্রজন্ম পরম্পরায় যাদের দিন কাটে, তাদের কাছে এই কল্যাণকর কার্যসূচীর কী মূল্য ? নাগরিক জীবনের সুখ সুবিধাভোগী, তথাকথিত আলোকপ্রাপ্তা মুষ্টিমেয় কিছু মহিলা এতে উপকৃত হতে পারেন কিন্তু সেই উপকারের আঁচটুকুও সংখ্যাগরিষ্ঠ নারীসমাজকে ছুঁয়ে যাবে না। আর এই জাতীয় প্রকল্প যদি সত্যিই নারীসমাজের সামগ্রিক কোনো কল্যাণ হত, তাহলে সংবিধানে ঘোষিত নারী-পুরুষের সমানাধিকার শুধু সাংবিধানিক নিয়ম হয়েই থাকত না, বাস্তবে তা কার্যকর হত। সাংবিধানিক নীতি এবং তার বাস্তব রূপায়ণে লক্ষ যোজন দূরত্ব রয়ে গেছে বলেই স্বাধীনতার একচল্লিশবছর পরেও অনুন্নত অনগ্রসর সম্প্রদায়ের সংগে অবস্থানগত পার্থক্য খুঁজে না পেয়ে মেয়েদের জন্য আসন সংরক্ষণের কথা ভাবতে হচ্ছে।

সুকন্যা

বর্ষ ৫ সংখ্যা ১০ □ ১/১৬ – ৩১ ডিসেম্বর ১৯৮৮
১৫ অগ্রহায়ণ/১ পৌষ ১৬ পৌষ ১৩৯৫

সম্পাদিকা গীতা চৌধুরী

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : গৌতম দাশগুপ্ত
ফটো : পাহাড়ী রায়চৌধুরী ও শংকর নাগ দাস

প্রতি সংখ্যা পাঁচ টাকা

বিমান মাশুল : পূর্বাঞ্চলে ৩০ পয়সা, ভারতের অন্যান্য স্থানে ৪০ পয়সা

মতামত

শিশুসুলভ প্রশ্ন

প্রতি সংখ্যায় 'অবসরের খেলা' যত্ন সহকারে মন দিয়ে পড়ি এবং এ বিভাগটি আমার কাছে খুব ভাল লাগে। শুধু ভাল নয় নিজেকে যাচাই করতে পারি ভাল-মন্দের দিক দিয়ে। কিন্তু ১৬-৩০ নভেম্বর '৮৮ সংখ্যাটির ১৪, ১৫, ১৬, ১৭ নম্বর প্রশ্নগুলো আমাকে নিরাশ করল। জানিনা কেন এত সুন্দর সুন্দর প্রশ্নের মাঝে শিশুসুলভ প্রশ্ন করে মনটাকে হাল্কা করে দিলেন লেখক। সুকন্যার মতো মহিলাদের একমাত্র প্রথম কাগজ এবং অসীমবাবুর মতো ব্যক্তির কাছে এরকম প্রশ্ন আর ভবিষ্যতে আশা করব না। ভুল হলে ক্ষমা করবেন অসীমবাবু।

রীনা সেন
কলকাতা-৩

কার ভুল লেখকের না মুদ্রণের

২/১৬-৩০ সেপ্টেম্বর '৮৮ সংখ্যার 'সাম্প্রতিক বই' বিভাগের অশোক সেনের লেখা 'মজার দুটো ছড়ার বই' লেখাটা পড়ে আমি কলকাতার বইপাড়াতে মায়া প্রকাশনীর খোঁজে গিয়েছিলাম 'একশো পিদিম জ্বলে' বইটা কেনার জন্য। সত্যি বলতে কি, এত লজ্জা পেলাম যে কি আর বলব? আমি দোকানদারকে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে আরো লজ্জা পেলাম। বইখানা কিন্তু 'ময়না প্রকাশনী' থেকে প্রকাশিত হয়েছে। 'মায়া প্রকাশনী' কিন্তু নয়। বইটা পড়ে মজা পেলুম ঠিকই কিন্তু লেখকের (অশোকবাবু) অসতর্কতার জন্যও মর্মাহত হলাম। তিনি লিখেছেন, 'সেই সুকুমারই এবার ছড়াবন্দী হলেন সাতান্নজন ছড়াকারের কলমে' আবার শেষ পরিচ্ছেদে লিখেছেন 'সাতাশটি পিদিমই জ্বলল'। মোটেই না। তা কী করে হয়। এ বইটাতে সাতান্নজন ছড়াকার মোট সাতান্নটি ছড়া লিখেছেন।

এখন প্রশ্ন হল এ জাতীয় ভুল কার? লেখকের না মুদ্রণের

ভাস্বতী মুখোপাধ্যায়
নর্দার্ণ এ্যাভেনু, কলি-৩৭

চিঠি লিখলে মন ভাল থাকে?

প্রতিদিন আপনার অনেক কথা বলার থাকে, যা বলতে পারেন না। এবং সেসব কথা না বলার কারণেই অনেক সময় অসুস্থ হয়ে পড়েন, মন খারাপ হয়। না, এখন আর অসুস্থ হতে হবে না। আপনার চারপাশে যেসব ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটছে, সেসব ঘটনার প্রতিক্রিয়া নিয়ে একটা ছোট চিঠি লিখে ফেলুন। সে চিঠিতে ব্যক্তিগত সমস্যাও থাকতে পারে আবার সামাজিক সমস্যাও থাকতে পারে। চটপট লিখে ফেলুন আর সুকন্যা দপ্তরে পাঠিয়ে দিন। আমাদের পছন্দ হলেই আমরা সে চিঠি ছেপে দেব। এরকম নিয়মিত সুকন্যায় চিঠি লিখুন, দেখবেন আর আপনার মন খারাপ করছে না। তবে হ্যাঁ, সুকন্যা কেমন লাগছে সেকথা লিখতে ভুলবেন না। চিঠির ওপরে লিখবেন : 'মতামত বিভাগ'।

আরো কিছু চাই

১ নভেম্বর সংখ্যা সুকন্যা বেশ দেরিতে হাতে পেলাম। পড়লাম পুরোটাই। 'স্তনের সমস্যা' লেখাটি ভাল লাগল। আমাদের অনেক নতুন করে সব কিছু ভাবতে সাহায্য করবে লেখাটি। গ্রিফিথ জয়নার সম্পর্কে আপনারা যা লিখেছেন, তা নতুন কিছু নয়। আমরা আগেই কাগজে তা পড়েছি। আমরা আরো কিছু চাইছিলাম। সুকন্যায় ছবির সংখ্যা আরো বাড়ালে হয় না? আর ফারহার লেখাটি মন ভরল না। ফারহাকে নিয়ে বড় একটা লেখা আশা করছি।

বিনতা, প্রমীলা, সেলিমা খাতুন
সোনারপুর, ২৪ পরগণা

চাই নতুন মুখ

হাস্যকর ব্যাপার, কভারের ওপর জ্বলজ্বল করছে লেখাটা ১৬-৩০ নভেম্বর '৮৮, স্টলে এসেছে কিন্তু ২৬ তারিখ-এ, ইদানীং সুকন্যার কোন সংখ্যাই ঠিক সময়ে বেরোয় না, তাই সবিনয়ে নিবেদন, দয়া করে ম্যাগাজিনের ওপর সংখ্যা প্রকাশিত হবার তারিখ উল্লেখ করবেন না। রঙিন পাতার ছাপা ভাল করার চেষ্টা করুন, আর একটা কথা 'ফ্যাশন'-এ গতানুগতিক চিত্রাভিনেত্রীর মুখ পত্রিকার প্রতি কোন ক্রেজ সৃষ্টি করে না। নতুন মুখ নিয়ে আসার চেষ্টা করুন না।

শর্মিলা মন্ডল
হাওড়া-৩

ইভ টিজিং কেন?

১৬-৩০ নভেম্বর সুকন্যা পড়লাম। কিন্তু বেশ দেরিতেই। পত্রিকা এখন এত দেরিতে বের হয় যে, পত্রিকা হাতে পাবার কোনো আনন্দই থাকে না। তবে নতুন ধরনের কয়েকটি লেখা দেখে ভাল লাগল। 'ইভ টিজিং' লেখাটি খুবই মনোগ্রাহী হয়েছে। কিন্তু কেন ছেলেরা ইভটিজ করে তা আলোচনা করলে ভাল হত। লেখা থেকে এ ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়নি। তবে সম্প্রতি কলকাতা পুলিশের ইভ টিজারদের দমন করার জন্য একটি সেল গঠন করা হয়েছে। এই অপরাধ নিবারণ শাখা কী ধরনের কাজ করবে। সেল গঠন হবার পর কাদের ধরা হয়েছে, আদৌ পুলিশ কোনও উৎসাহ দেখাচ্ছে কিনা, এর ফলে রাস্তাঘাটে মেয়েরা নিরুপদ্রবে রাস্তায় হাঁটতে পারবে কিনা? এসব বিষয়ে একটি তথ্যনিষ্ঠ প্রতিবেদন আশা করছি।

আশা ভোঁসলেকে নিয়ে লেখাটা মন কেড়েছে। আশা সম্পর্কে আমরা অনেক কিছু জানতে পেরেছি। ঠিক এরকম ভাবেই বাংলার অন্যান্য সংগীত শিল্পীদের সম্পর্কে জানতে চাই। পরিশেষে বলি সুকন্যা আগের থেকে এখন অনেক ভাল হয়েছে, কিন্তু কেন আমাদের হাতে পৌঁছচ্ছে না জানাবেন কী?

সুমন্ত, মালা, দময়ন্তী, সুতৃষ্ণা রায়
কলকাতা-৭০০০০৫

বাংলাদেশের কবিতা

মৃগয়া

আল মাহমুদ

একটি হরিণ ডাক দিয়েছে মনের ভেতর
একটি চিতল বনের জন্তু
হরিণী তুই মুখ ঢেকে নে নীল অরণ্যে
নইলে যে তোর বুকের তন্তু
ছিন্ন হয়ে ছড়িয়ে যাবে প্রেমের জন্যে।

একটি পুরুষ ডাক দিয়েছে এক নগরে
তৃষ্ণা কাতর শুকনো মাটি
বালিকা তুই গা ঢাকা দে শহর ছেড়ে
নইলে যে তোর সোনার বাটি
সেই ভিখিরি জবরদস্তি নেবে কেড়ে।

চন্দ্রমেহন

সুরাইয়া খানম

চাঁদ উঠলে চন্দনা চায় ছন্দে নাচে বেবাক ছুঁতে
খঞ্জনা তার তরুর বাহার বুকের উপর স্পর্শ রাখে।
লাবণ্য তার লালিত্য দেয় মাটির বুকে বুক ঠেকিয়ে!

চাঁদ উঠলে লতানে সাপ শিথানে তার মুখটি বাড়ায়।
চাঁদ উঠলে সাপের ঝাঁপি বুকের ভিতর আপনি দোলে!
বেদেনী তার মন্ত্র ভুলে সাপের নাচের মুদ্রা তোলে!

চাঁদ উঠলে চিতাবাঘের চিতানো বুক আহার বাহার
চিত্রিত সব চন্দ্র দেউল নর্তকী সব গহনা ছুঁড়ে
চিতাবাঘের পায়ের কাছে দুলতে থাকে দু'হাত তুলে!

চাঁদ উঠলে সিংহ শিকার ভ্রমণ-বিহার এলোমেলো
নিশিতে পায় সভ্যতাকে;

চাঁদ উঠলে সিংহ ডাকে – উর্বশীদের গর্ব জ্বলে।



যাবে কদ্দূর

ফজল শাহাবুদ্দীন

যদি আমি মরে যাই
মরে গিয়ে সরে যাই
সরে গিয়ে চলে যাই
দূর

তুমি সাথে যাবে কদ্দূর?

যদি আমি বেঁচে থাকি
বেঁচে থেকে ভালোবাসি
ভালোবেসে ছুঁয়ে ছুঁয়ে
ভ'রে দেই
তোমার দুপুর
তবে তুমি যাবে কদ্দূর?

মহাস্থানগড়ে যাত্রা

জাহিদ হায়দার

চলুক উৎসব রাত্রিভর
শরীর দুটো গায় জীবন-গান,
অসীম আনন্দে অমৃত পান
উজ্জ্বল আঁধারের মহান চোর।

ওলো নারী, সহজে খুল না তনু খুলি না জবান।
নিশীথে নিশির ডাক শুনে যদি শিথিল হয়েছে শাড়ি
তবে আর দ্বিধা কেন?

কাঁকরের রাঙা মাটি অপরূপ শয্যা হবে
চন্দনের ঘ্রাণ হবে শরীরের উষ্ণতম ঘাম –
ওলো নারী ভয় নেই, চাষের চৌষট্টি কলা আমিও শিখেছি,
আমিও শিখেছি নারী আবাদের মাতৃভাষা সঠিক শৃঙ্গার।



প্রকৃতির নিয়মে ঋতুর পরিবর্তনে শীত আসে। সব দেশে। ঘাসে ঘাসে টলমল করে রাতের শিশির। মাথার ওপর ঝুলে থাকে কুয়াশা। প্রতিটি ঋতুর আলাদা করে একটা রূপ আছে। এই রূপের প্রকাশ গ্রামে এক রকম, শহরে অন্য। গ্রাম-শহর সব মিলিয়েই বিভিন্ন মানুষ শীতকে উপভোগ করে নিজ নিজ পরিবেশের সংগে খাপ খাইয়ে। এক দলের কাছে যা উপভোগের, অন্য দলের কাছে তাই দুর্ভোগের।

বিশাল প্রান্তরে, বাংলার পল্লীর মাঠে মাঠে হিম ঝরে। নবান্নের গন্ধ ওঠে। আবার যান্ত্রিক সভ্যতার ঘেরা-টোপে শহরের ধোঁয়াশায় দমবন্ধ হয়। নদীর বুক থেকে হিমেল হাওয়া হৃদয়ের গভীরে জমে থাকা স্মৃতিকে কাঁপিয়ে দেয়। সুখস্মৃতি, দুঃখস্মৃতি একাকার হয়ে যায় হীরের কুচি ছড়ানো নীল আকাশের চাঁদোয়ার নিচে।

সৌরেন মিত্র শীতের সবটুকু রূপ রস বেদনা হতাশাকে মূর্ত করেছেন তাঁর এই প্রতিবেদনে। সেই সংগে শীতের বিভিন্ন দিক নিয়ে দেওয়া হল আরো একগুচ্ছ প্রতিবেদন।

ফটো : তপন মুখার্জি

কলকাতা এখন কংক্রিটের অরণ্য। কিন্তু দিন দিন সে বেশ সুন্দর হয়ে উঠছে। যত দিন যাচ্ছে পরীদের পোশাক পরে এ নগরী রূপসী হচ্ছে। কলকাতা এখন রুপোলি পর্দার নায়িকা। সন্ধের পর সুন্দর রঙিন আলোগুলি যেন নায়িকার আভরণ। শীতের সময় কলকাতা রঙিন হয় আরো বেশি। কিন্তু শীত কি আসে কলকাতায়? শীত না এলেও এ শহরে শীতকাল আসে। শীত অনেকদিন হল কলকাতায় আসা ছেড়ে দিয়েছে। পিকাশোর কিউবিস্ট ছবির মত নাগরিক আকাশটুকু নীল ডিজেলের ধোঁয়ায় ডুবে গেছে। কলকাতায় দাঁড়িয়ে বড় আকাশ দেখতে গেলে গড়ের মাঠে যেতে হবে। কলকাতা গ্রিন সিটি না হলেও ঐ নামমাত্র সবুজটুকু এই শহরের হৃদয় হয়ে ওঠার জন্যে প্রাণপণে লড়ে যাচ্ছে।

বেঁচে থাকার অনেক দুঃসহ কাঁটাতারের বাঁধন টপকে এখনো বাঙালিরা দুর্গাপুজোর পর থেকেই কাঙালের মত হাত পেতে থাকে একটু শীতের জন্যে। কিন্তু সবকিছুর মত কলকাতার বাঙালিদের জীবন থেকে বিক্রি হয়ে গেছে শীতও। সভ্যতার সংগে যন্ত্রের একটা সম্বন্ধ আছে। সেদিক থেকে দেখতে গেলে সভ্যতা যন্ত্রের পিঠে চেপে এগোচ্ছে। আর সেই যান্ত্রিক সভ্যতা মাঠ-ঘাট, শ্যামল বন, দীঘল দীঘি, জলাভূমি গিলে খাচ্ছে।

শীত যদি কথা বলতে পারতো তাহলে সবাই শুনতো শীত বলছে – আমার আসন কেড়ে নিলে আমি বসব কোথায়! আমার শিশিরের জামা ছিঁড়ে যায় কারখানার চিমনির খোঁচায়, আকাশচুম্বি বাড়ির কার্নিশে।

তবুও শীতে ফুল ফোটে। টবে চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়া যায় রূপ প্রতিযোগিতায়। হর্টিকালচারের বাগানে বা বিধানসভার প্রাংগণে পুষ্প প্রদর্শনী হলে বুঝতে হবে শীত এসেছে। চিড়িয়াখানায়, শিবপুর বোটানিকাল গার্ডেনে ভিড় বাড়ছে মানেই শীত এসেছে। পশ্চিমবংগ সরকারের 'মধুকর' মাতলা নদীর ওপর দিয়ে ভাসতে ভাসতে চলেছে সুন্দরবন – অর্থাৎ শীত এসেছে। কিন্তু সাইবেরিয়ার হাঁসেরা যে তাদের মালা ছোট করছে। ভোর-সন্ধের আকাশ ছাওয়া সেই পরদেশী পাখির ঝাঁক এখন আর চিড়িয়াখানায় নামছে না। কী কারণে যেন কাশ্মিরী শাল বিক্রেতা সেইসব ফর্সা সুন্দর তরুণদের আনাগোনা কমে গেছে। ভেড়ার লোম থেকে খাঁটি পশমের পোশাক পসারিণী ভূটিয়ারা অবশ্য কলকাতার আনাচে-কানাচে ঝলমলিয়ে ওঠে শীতের গোড়াতেই।

নিম্নবিত্ত বাড়ির কর্তারা শীতে যেন একবারটি জেগে ওঠেন। এই শীতের দুপুরেই তো আকাশের হাতছানিতে ছেলেমেয়ের হাত ধরে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে পড়তে হয়। শিক্ষার আর এক দিক তো সবকিছু চোখে দেখে জানা। মিশরের মমি আছে যাদুঘরে ওরা দেখুক। চিনুক আকাশ থেকে খসে পড়া উল্কা পাথর কীরকম দেখতে। কলকাতায় কোথায় কোথায় মহুয়া গাছ আছে। মেহগনি, নাগলিংগম আছে কোথায়। গৃহকর্তাকে শুধু ভাবতে হয় পকেটের কথা। সার্কাস,প্ল্যানেটোরিয়াম, বিড়লা মিউজিয়াম কিংবা চিড়িয়াখানায় সপরিবারে একটা শীত-দুপুর কাটাতে মোটা টাকা খরচ। সেই নিম্নবিত্ত কর্তাটি এখন নিশ্চয় ভাবেন তাঁর ছেলেমেয়ের জন্যে কোন শীতের দুপুর নেই, বিক্রি হয়ে গেছে। ঐ দুপুরগুলো তখন কিনে নিয়েছে লাল মারুতির দল আপন সন্তানদের দিকে তাকিয়ে বড়জোর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলতে পারেন তিনি।

ব্রিটিশরা এদেশে রাজত্ব পাতার পর থেকে আমরা বাঙালিরা শীতকালকে একটু অন্য চোখে দেখি। সাহেবরা চলে গেছে কিন্তু পৌষে বড়দিনটা আমাদের দিয়ে গেছে। সার্কাস, ঘোড়ার দৌড়ে টাকা ডবল, চিড়িয়াখানা এসব ওরাই তৈরি করেছিল। আর ছিল মেট্রো গোল্ডউইন মেয়ারের দুঃসাহসিক মারপিটের ছবি। সেই সংগে শীতের কেক। যা আজও ট্রাডিশান। আচার আচরণ রুচি – এরকম অনেক কিছু আমরা সাহেবদের কাছ থেকে ধার নিয়ে আর শোধ দিইনি। এটা যেন সাহেবরাও চেয়েছিল। অবশ্য প্রথম দিকে সাহেবরা ঠিক করেছিল তারা ভারতের কোন ধর্মীয় এবং সামাজিক ব্যাপারে হাত দেবে না আর ভারতীয়রাও ইংরেজি ভাষা এবং বিজ্ঞান শিখে উঠে বসুক এটাও তারা চাইত না। কারণ আমেরিকার মত এদেশও তাহলে হাতছাড়া হয়ে যাবে। বিদ্যা হচ্ছে স্বাধীনতা সংগ্রামের বীজ। যাক সে কথা। ওরা শীতের রোদে কেল্লার কাছে বা গড়ের মাঠে ব্যান্ড বাজিয়ে নেটিভদের মাতিয়ে রাখত।

কিন্তু আমরা ওদের অনেক কিছু নিয়ে ফেললাম। ওরা আমাদের পয়লা বৈশাখ নিল না কিন্তু ফার্স্ট জানুয়ারিটা এখন আমাদেরও। ওরা আমাদের কৃষ্ণের জন্মদিন নেয়নি কিন্তু আমরা নিয়ে ফেললাম ওদের খ্রিস্টের জন্মদিন।

এর কারণ বোধহয় ওরা আমাদের চেয়ে সব ব্যাপারে শক্তিমান আর দক্ষ ছিল। ওরা শীতের দেশের লোক বলে ওদের শীতের পোশাক-আসাক ছিল অন্যরকম। আমরা সেটা গ্রহণ করেছি। কোট প্যান্ট,সোয়েটার আমাদের গা থেকে চাদর পাঞ্জাবি খুলে নিয়েছে। গায়ে জোর থাকলে একটা জাতি অন্য জাতিকে শাসন করতে পারে কিন্তু রুচি পাল্টাতে পারে কি? সাহেবরা কিন্তু এ ব্যাপারে বেশ কিছুটা সফল।

বাঙালি জীবনে শীতের ভূমিকা ছিল একটু অন্যরকম। এমনকি ইংরেজ আসার পরেও। কারণ তার পটভূমি ছিল অন্যরকম। জীবিকা ছিল বেশিরভাগ মানুষেরই জমি-জিরেত কেন্দ্রিক। পৌষে গোলা ছাপাছাপি নতুন ধান। মাটির ঘরে আলপনা এঁকে নবান্নর মত এমন কাবিক উৎসব দেখে সাহেবরাও নাকি থ হয়ে যেত। খেজুর রস ঘন করে জ্বাল দিয়ে তার সংগে চড়াই পাখির নখের মত সরু বাসমতি চাল আর গরুর খাঁটি দুধ দিয়ে যেটি তৈরি হত তার নাম পরমান্ন। নাকি অমৃত! বাংলাদেশ যখন কাটাছেঁড়া হয়নি তখন ঐ মেঘনা, পদ্মা, কপোতাক্ষীর জলজলে গ্রামগুলোয় পৌষ সংক্রান্তি মানেই উৎসব। যার অন্য নাম মকর সংক্রান্তি। গ্রামবালাদের পিঠে ছিল শিল্প কাজ। কী সব নাম সে সব খাদ্যের। গোকুল পিঠে, ক্ষিরপুলি, পাটি সাপটা, চিতল পিঠে, চন্দ্রপুলি, দুধপুলি, ছাইন্যা পিঠে আরো কত কী।

খুব কি বেশিদিন আগের কথা এসব? এই বিভূতিভূষণ-শরৎচন্দ্র আমলেও ছিল। তখন আরো একটা জিনিস বাঙালিদের মধ্যে ছিল। যেসব বাঙালির ঘরে মা-লক্ষ্মী অচলা, তাঁরা শীতের হাওয়া গায়ে লাগলেই বাকসো-পেঁটরা গুছিয়ে বেরিয়ে পড়তেন হাওয়া খেতে। সে সময় এই বেরিয়ে পড়ার নামই ছিল 'হাওয়া খাওয়া'। যসিডি, দেওঘর, কার্মাটার, ভাগলপুর, মধুপুর, শিমূলতলা এসব জায়গায় অনেক বাঙালি ভদ্রলোক বাড়ি বানিয়ে রাখতেন। শীতে হাওয়া খাওয়া বাঙালি চরিত্র বাংলা সাহিত্যেও দিব্যি স্থান করে নিয়েছে।

কৃষিকেন্দ্রিক আর শিল্পকেন্দ্রিক সমাজ চরিত্রের অনেক হেরফের আছে। শিল্পকেন্দ্রিক সমাজে আবেগের ঘাটতি

আছে। সময়ের মূল্য সেখানে নিক্তির কাঁটায়। এখানে মানুষ সভ্যতাকে এগিয়ে দিতে ব্যস্ত। শীতে মধুপুর শিমূলতলায় দেড় দু-মাস হাওয়া খাওয়ার সময় নেই। বড়জোর কলকাতায় একটা পাঁচদিনের টেস্টম্যাচ দেখা যেতে পারে। কিন্তু আগেকার ওঁরা কি শুধুই হাওয়া খেতে যেতেন ? না, তা নয়। তাঁরা যেতেন প্রকৃতির কোলে মাথা রাখতে। শীতে শাল-মহুয়ার গন্ধে ওখানকার বাতাস তখন সুরা। আর আকাশ যেন নীল পেয়ালা। এর সঙ্গে মিশে যেত বাঁশির সুর, ধামসার বাদ্য। বাঙালি মানুষের নেশা লেগে যেত। অনেকেই তখন জমি কিনে বাড়ি বানাতেন। এখন সেসব বাড়ি হয় বেহাত, না হয় হানাবাড়ি হয়ে জঙ্গলের মধ্যে পড়ে আছে।

পৌষ মাসে ওসব জায়গায় শীত যখন জমিয়ে পড়ত তখন হাওয়া খেতে যাওয়া বাঙালি ভদ্রজনরা আনন্দে বাংলাদেশের আত্মীয়-বন্ধুদের চিঠি লিখে আমন্ত্রণ জানাতেন দুদিন ঘুরে যাবার জন্যে। বন্ধুরা অনেকেই যেতেন। খাওয়া-দাওয়া আর মধুর আলস্যে সময় কাটাতে কাটাতে বেলা গড়িয়ে যেত। বাড়ির যিনি কর্তা তিনি বিকেলে ফরেসডাঙার জলচুড়ি তোলা কোঁচানো ধুতি আর সার্জের পাঞ্জাবির ওপর দামী আর ভারী কাশ্মিরী শাল চাপাতেন। হাতে কারুকার্য করা রুপোয় বাঁধানো ছড়িটি ধরে বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে নদীর ধারে বেড়াতে যেতেন।

এসব ব্যাপার এখন শেষ হয়ে গেছে। সময় কোথায় মানসিকতা কোথায়। এখন অফিসের ছুটিও বিক্রি হয়। দেশজোড়া কর্মযজ্ঞের ব্যস্ততায় এখন শীত উপভোগের ধরন-ধারণ পালটেছে।

এখন শীতকাল মানেই পিকনিক, সুন্দর জামা কাপড়ে নিজেকে সাজানো কিংবা কোন টুরিস্ট স্পটে এক আধটা দিন কাটিয়ে আসা। এসব কিছু না হলেও নিঝুম দুপুরে খোলা আকাশের নিচে সবুজ ঘাসের গালিচায় রোদ্দুরে শুয়ে থাকা। আর ভ্রমণের নেশা যাঁদের আছে তাঁরা এ ঋতু বৃথা বয়ে যেতে দেন না। পুরীর সমুদ্র সৈকত ডিসেম্বরে দারুণ। ঘাটশিলার বনপাহাড়, ঝাড়গ্রামের শালবন, চাকুলিয়ার খোলা আকাশ, জয়রামবাটী, কামারপুকুর, কিংবা ব্যান্ডেল থেকে একটু দূরে হংসেশ্বরী মন্দির এসব শীতকালেই ভাল।

শীতের দেশের মানুষ – যাঁরা তুষার নিয়ে ঘর করেন তাঁরা নিশ্চয় গ্রীষ্মের প্রার্থনায় ঠকঠক করে কাঁপেন। আর আমরা ঠিক তার উল্টোটা। ওঁদের 'সামার' প্রাণ আর আমাদের উইন্টার হৃদয়। শীতের দেশের মানুষরা প্রশান্ত, অতলান্তিক পার হয়ে ভারতে এসে গোয়ার সি-বিচে ঘন্টার পর ঘন্টা পড়ে থেকে গাত্রবর্ণ পিঙ্গল করেন আর আমরা ছুটি শীতে দার্জিলিং যদি ভাগ্যে জোটে তুষার বর্ষণ।

আর শীত আসুক, না আসুক খাওয়া-দাওয়াটা জমে শীতেই। পিঠে পায়েস ছাড়াও রসনা এ সময় অন্য বাসনায় লালা সিক্ত। ফুলকপির সঙ্গে ভেটকি কিংবা গলদার জুটি শীতেই দারুণ। কড়াই-সুঁটির কচুরি, ফুলকপির সিঙাড়া এসব রসনার নৈবেদ্য শীতেই। আরো আছে। ব্রয়লারের বড় বড় পিস করে আদাবাটা কাঁচালঙ্কা, বেশি করে টক দই, আর টমেটো দিয়ে কাই গায়ে গায়ে রেখে বিরিয়ানির সঙ্গে তোফা শীতকালেই। সুন্দরবনের কাঁকড়া রসুন পেঁয়াজ দিয়ে ঝাল ঝাল কিংবা রাজকুমার চেহারার সোনারজল করা ট্যাংরা ধনেপাতা দিয়ে ঝাল দারুণ। শীতকাল স্যালাডের কাল। বিট, গাজর, শশা পেঁয়াজ টমেটোর সঙ্গে একটু ভিনিগার, সঙ্গে চিলি সস ব্যস সঙ্গে থাকুক চিকেন তন্দুরী। পাকা খাসি বা ভেড়ার মাংস বড় বড় পিস করে আলু না দিয়ে, টক দই পেঁয়াজ টমেটো দিয়ে রান্না হোক। সঙ্গে থাকুক রুমাল রুটি। শীতের আর একটি ভাল খাবার গরম লুচি পয়ড়া গুড়ে ডুবিয়ে – আ হা-হা। এছাড়া ফলবাজারে কমলা লেবুর ঝলমলানি তো আছেই।

কলকাতায় বসে শীতকে ঠিক উপভোগ করা যায় না। দামী দামী গরম পোশাক যদি ব্যবহারই না করা গেল তাহলে কিনে কী লাভ ? শীত উপভোগ করতে হলে মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূমের গ্রামে যেতে পারেন। এই তিন জেলার গ্রাম খুব রূপসী। পৌষ, মাঘের বিভিন্ন তিথি ধরে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় মেলা পার্বণ লেগেই আছে। অজয় নদের ধারে কেঁদুলির বাউল মেলা, শান্তিনিকেতনের পৌষ মেলা এরকম ছোট বড় অনেক মেলা শীতেই। খোদ কলকাতাতেই শীতে একটা ভাল মেলা হয়। সেটা হল সাবর্ণ চৌধুরীদের চন্ডী মেলা। অবশ্য এখন ময়দানে শীতে বইমেলা, শিল্প মেলা, শাড়ি মেলা, চর্মদ্রব্য মেলা অনেক কিছুই হয়। এসব মেলার কথা ভাবলে প্লাস্টিকের পদ্মফুলে কথা মনে হয়। কোথায় সেই টলমলে পদ্ম দীঘির ঐতিহ্য শহরকে আমরা গ্রহণ করেছি আমাদের অনেক সুখ সুবিধের জন্যে কিন্তু জীবনায়নের সব জানলাগুলো দিয়ে আমরা শহরের মুখ দেখতে রাজি নই। পঞ্চম ঋতু চিত্র-চরিত্রের রূপ-রেখা আছে খোলা আকাশের নিচে শিশির ভেজা বাতাস আর মাটিতে। বিদেশি পাখির ভেজা ডানায়। নীল কুয়াশায়। অগাধ পাকা ধানের শীষে।

তবুও শীত আসে এই শহরে। আসে ওদের কাছে – ফুটপাতে, ফ্লাইওভারের নিচে। সারারাত শীতের জ্বালায় কুঁকড়ে পড়ে আছে হাজার হাজার অর্ধ-নগ্ন শরীর। শীত আসে ওদের কাছে কখনো মৃত্যুর সাজে। পথবাসী মানুষগুলোর শোক তখন শান্তির মত জ্বলন্ত চিতার উত্তাপে কেঁপে কেঁপে ওঠে।

একটা গল্প পড়েছিলাম অনেকদিন আগে। গল্পের নাম, লেখকের নাম মনে নেই। গল্পটা ঠিক শীতকে নিয়ে নয়, তবে শীতের একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল গল্পটিতে। সেই ভূমিকাটুকু এখনো মনে আছে।

একটি নামী রাজনৈতিক দলের জমায়েত হচ্ছে ময়দানে। শীতের কলকাতা তখন রাজনর্তকী। দূর গাঁ গঞ্জ থেকে এসেছে লক্ষ লক্ষ ভুখা মানুষ। তাদের অনেকেই জীবনে প্রথম কলকাতা দেখল। সন্ধেয় ফেরার পালা। হাওড়া স্টেশনে মানুষের মিছিল। সেই ভিড়ে একটি গ্রাম্য কিশোর হারিয়ে গেল। মিছিলের সঙ্গে সেও এসেছিল। তার বাড়ির সবাই তাকে খোঁজাখুঁজি করতে লাগল। অনেক রাত্রে সেই কিশোরটিকে পাওয়া গেল স্টেশনের একটি কোণে। অকাতরে ঘুমোচ্ছে শীতে কোকড়ানো একটি কিশোর শরীর।

আর শীতকে প্রতিরোধ
করতে সে গায়ে জড়িয়েছে সেই রাজনৈতিক
দলের দলীয় পতাকা।

তাহলে তো শীত আসে নানা জনের কাছে নানা ভূমিকায়। পৌষের পাকা ধান মুঠোয় চেপে ধরলে কারো হাত ধরে যায় শীতের শিশিরে কারো রক্তে। □

কলকাতা ময়দানের একটিই ঋতু ঃ শীত

হারুন-অল-রসিদ এখন আর পাঁচটা বল নিয়ে লোফালুফি খেলা দেখায় না মনুমেন্টের নিচে। বছর দশেকেরও বেশি হয়ে গেল হারুন সত্যজিৎ রায়ের গল্পে বন্দী হয়ে গেছে। এখন মনুমেন্টের নিচে রেলিঙের এধার ওধার জুড়ে বসেছে কৃমিনাশক ওষুধের ফিরিঅলা, দাঁতের মাজনের ক্যানভাসার আর রাজ্যের অবাঙালি চা-নাস্তার দোকানি। সম্বৎসর এদের ভিড়ের পাশাপাশি, ঠিক এই শীতের সময়টাতেই রোদ পোহাতে চলে আসেন মফস্বলের মানুষ।

কথাটা মিথ্যে বলে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে পারেন কেউ কেউ। 'ধুর মশাই, সেই বনগাঁ থেকে লোকে আসবে কলকাতায় মনুমেন্টে রোদ পোহাতে? কেন বনগাঁয় কি রোদ্দুর বাড়ন্ত?' না, মশাই কথাটা মিছে নয়। লাখ কথার মত সত্যি। তবে সত্যিই কি আর বনগাঁ থেকে মানুষ আসে রোদ পোহাতে আজ্ঞে, তা নয়। নানান কাজে মফস্বল থেকে মানুষকে তো কলকাতায় আসতেই হয়। তা, শীতের দুপুরে ফুলহাতা সোয়েটারটা গলায় বেঁধে কিছুক্ষণ কলকাতার শীতে গা তেতে নিলে মন্দ কী বিশ্বাস না হয়, এই লেখা পড়ার পর যে কোনদিন দুপুরবেলায় মনুমেন্টের নিচটা ঘুরে আসুন, সত্যিমিথ্যেটা যাচাই হয়ে যাবে। সেই সঙ্গে বিনে পয়সায় একটু রোদও না হয় খেয়ে নিলেন।

শীত মানেই তো মেলা, মেলা, হাজার খেলা। শীত মানেই তো ময়দান কাঁপিয়ে ছেলেবুড়োর দাপাদাপি। কিন্তু জানেন কি, শীত মানে ধর্মগুরুদের বাই উথলে ওঠা? মাফ করবেন, কোনো কটূক্তি করছি না। যে কোনো দুপুরে আপনি এসপ্ল্যানেড চত্বরে ঘুরে আসুন। কার্জন পার্কের ভেতরে চোখ বোলালেই দেখবেন, সাদা বা গেরুয়াধারী কোনো মানুষ তদ্গতচিত্তে কিছু বলে চলেছেন। আর বেশ কিছু নারীপুরুষ শুনে যাচ্ছেন ভক্তিমনে। ডুবে যাচ্ছেন ভক্তিরসে। গ্রীষ্মকালে এ দৃশ্য হয়তো দেখেছেন সন্ধেবেলায়। যেহেতু শীত, এখন দুপুরবেলায়। তবে, সন্ধের পর চাদর-কম্বল জড়িয়ে যে ভক্তিরসের আলোচনা হয় না এমন নয়।

সে যাকগে। শীত মানেই তো কলকাতার ময়দানে মেলা। এই তো এবার পুজোর ঠিক পরেই, শীত পড়তে না পড়তেই হয়ে গেল 'উওমেন ৮৮'।



ফটো : তপন মুখার্জি

এরপর শুরু হয়েছে হস্তশিল্পের মেলা। তারপর শুরু হবে এক্সপো, লেক্সপো, পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থমেলা এবং সেই ঐতিহ্যবাহী পুস্তকমেলা। আর এই মেলা মানে তো শুধু কেনাকাটা নয়। মানুষে মানুষে গড়ে ওঠে পরিচয়, সখ্যতা। ভিড় আর ধুলোর ভেতর আপনি ইচ্ছা করলেই হারিয়ে যেতে পারেন। কেননা, তখন 'কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা'।

'কলিকাতা পুস্তক মেলা'র কথাই ধরুন না কেন। এটা তো অনস্বীকার্য যে, এই মেলা কলকাতার ফুসফুসে কিছুটা জীবনীশক্তি ঢুকিয়ে দেয়। মাঘের শীতেও মানুষ তেতে ওঠে। শুধু কলকাতা তো নয়, কোচবিহার, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া থেকেও মানুষ আসেন এই মেলায় অংশ নিতে। একদিকে যেমন পুস্তক ব্যবসায়ীরা, অন্যদিকে তেমন নামী-অনামী, দামী-অদামী কবি-সাহিত্যিকের ভিড়। বলা যেতে পারে, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের সর্বস্তরের মানুষের এ এক মহামিলন ক্ষেত্র। আর আপনি যদি কারো প্রেমে পড়তে চান, তো, এই মেলাই হল একমাত্র মাধ্যম। আলাপ করুন – পরখ করুন – ঝুলে পড়ুন। এমন উন্মুক্ত উদ্যান আর কোথায় আছে বলুন? আপনি চেনা দিতে চাইলেই চেনা দিতে পারেন। না চাইলেই লুকিয়ে পড়তে পারেন। কেউ মানা করবে না। আর আপনার সৌভাগ্যই বলুন কিংবা দুর্ভাগ্যই বলুন, প্রতিদিন কোনো না কোনো বিখ্যাত শিল্পী সাহিত্যিকের দেখা পেয়ে যাচ্ছেন। আর যে মহাশয়া, আপনি যদি শুচিস্মিতা হন তো মৃদুসঙ্গও পেয়ে যেতে পারেন আপনার প্রিয় নভেল লেখকের। দুপুর থেকে রাত নটা অবধি এমন হৃদয় খুলে কথা বলার উদ্যান আর কোথায় পাবেন বলুন?

এই মেলার আশপাশ জুড়ে শীতের দুপুরগুলিতে শুরু হয় আরেক মেলা। এ মেলা পনের দিনের আয়ু নিয়ে জন্ম নেয় না। কিছু তরুণের তারুণ্য ছড়িয়ে যায় শীতভর সবুজ মাঠে। সাদা পোশাকে মাঠ থেকে মাঠে মনুমেন্টের চৌহদ্দি থেকে ভিক্টোরিয়ার সম্মুখ-ভাগ ক্রিকেটের আসর জমে। ছোটাছুটি লোফালুফি আর তরুণ-তরুণীর 'হাউজ দ্যাট' চিৎকারে কলকাতার বাতাস হাসতে থাকে। হেসে গড়িয়ে পড়ে সবুজ ঘাসে, ব্যাটে, বলে। যাঁরা খেলেন তাঁরা তো বটেই, চাদর আর সোয়েটার মুড়ি দিয়ে যাঁরা সেই খেলা দেখেন এবং একই সঙ্গে রোদ্দুরে সেঁকে নেন মন ও দেহ, তাঁরাও খেলার ময়দানকে নিয়ে যায় অন্য এক স্বপ্ন রাজ্যে। সেখানে কোনো গ্রীষ্ম নেই। কোনো বর্ষা নেই। শুধু একটিই ঋতু সেখানে শীত-শীত।

'কে নিবি গো কিনে আমায়/কে নিবি গো কিনে' – না, এমন স্বরে কলকাতার ময়দানে হাঁক পাড়ে না কেউ। তবে, সন্ধে হলেই ভিক্টোরিয়ার পেছনে কিংবা সামনে এই বেচাকেনার খেলা চলে মৃদুভাবে। দেহপসারিণীর দল

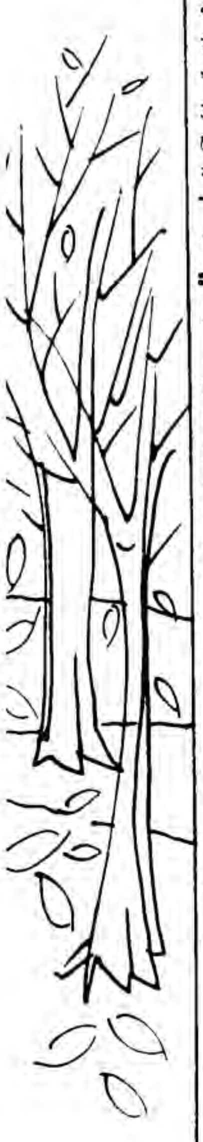


আধো অন্ধকারে মারময়দানে কিংবা দুহাত তুলে ভূতের নাচ জোড়া গাছগুলোর নিচে লীলা শুরু করে অর্থের বিনিময়ে। বনগাঁ, ক্যানিং লোকালে আসা মেয়েরা কিছু গন্ধ উগরে দিয়ে যায় কলকাতার বাতাসে। লোকচক্ষুর আড়ালে। শীত সন্ধ্যায় একদিকে মানুষের আনন্দরোল, অন্যদিকে হৃদয়নিংড়ে বিষাক্ত বাতাস ছড়িয়ে দেওয়ার এই বিপ্রতীপ চিত্র ময়দান ছাড়া কোথায় মিলবে বলুন? রাত বাড়লেই দৈত্য এসে হানা দেয় ঘরে। থুড়ি, ময়দানে। ডেকরেটারদের কর্মচারীরা, নাইটগার্ড আর দোকান পাহারাদার মিলেমিশে তৈরি করে ময়দান রাত্রি। মেলা প্রাঙ্গণের ভেতরে কাঠ কিংবা টায়ারের আগুন জ্বেলে শরীর সেঁকতে সেঁকতে ঘুমিয়ে পড়ে 'রোল কর্ণার'-এর বিশ্রী মোদক। তার গায়ের আড়াই হাতি চাদরের কোণে ততক্ষণে জায়গা করে নিয়েছে মেলার খাদের উচ্ছিষ্টভোগী সারমেয়টি। ক্রমশ ভোর হয়। এক প্রাগৈতিহাসিক ভোর নেমে আসে কলকাতায়, ময়দানের বুকে ভর করে। যেন স্বর্গ থেকে নেমে আসছে আলোকপিন্ড। কলকাতা গরীয়ান হয়ে ওঠে। ঘন কুয়াশা ভেদ করে আলোয় ভেজা পাখনায় ভোর নামে ময়দানে। আবছা আলোয় জগিং করতে করতে এগিয়ে আসেন কোনো এক ঝুনঝুনওয়ালা, এক আলুওয়ালা, জনৈক সেনসাহেব, মিস্টার রবার্টসন, শ্রীমতী কণিকা ভদ্র, কুমারী লালিমা প্রমুখ। কুয়াশা ভেদ করে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে যায় সঞ্জীব আর সঞ্চিতা। শীতরাত্রির উষ্ণক্লান্তিকে কুয়াশায় ভিজিয়ে দিতে মর্নিং ওয়াক শুরু করে। রবীন্দ্র সদনের সামনে দিয়ে ছোটে স্টেট ট্রান্সপোর্ট। কুয়াশা ছিঁড়ে বেরিয়ে আসে ফোর্ট উইলিয়মের গাড়ি। খাকি জামা, খাকি প্যান্ট, চাদর আর মাফলারে কান-মাথা ঢেকে জ্বলন্ত উনুন, কেটলি, মাটির ভাঁড় নিয়ে ময়দানে ঢোকে গিরিধারী সিং। আলো আসে ময়দানে। চারিদিকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। মানুষ ডানা ঝাপটায়, হাত-পা টান করে শরীর ঝাঁকিয়ে নেয়, গরম করে। আবার আরেকটি দুপুর, আরেকটি মোহনীয় রাত্রির জন্য প্রস্তুত হয়। গ্রীষ্ম বা বর্ষায় কলকাতার ময়দান মানুষের যে পরিমাণ অভিশাপ কুড়োয়, শীত সেই অভিশাপ কাটান দিতেই ব্যস্ত থাকে কয়েক মাস। মানুষের হাসি, মানুষের স্বস্তি, আশীর্বাদের গন্ধ ফুল হয়ে ঝরে পড়ে। খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনের পাতায় কলকাতা ময়দান নায়ক সেজে যায়। আহ্বান জানায় তার উষ্ণতায় ওম নেবার জন্য।

এক আমেরিকান নারী একবার নিজের ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স দিয়ে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল : 'আমি যে কোনো পুরুষকে সান্নিধ্য দিতে প্রস্তুত। আমাকে উপভোগ করুন। বিনিময় – মাত্র দশ পাউন্ড। ফোন... '। ময়দানও তেমনি প্রতি সকালে হাতছানি দেয়, এসো আমাকে চুম্বন কর, আমাকে উপভোগ কর। বিনিময় – তোমাদের ভালবাসা।... মানুষ অবশ্যই সাড়া দেয় সে ডাকে। কারণ, কলকাতার রসপিপাসু মানুষ জানে, ময়দানে একটিই ঋতু আসে – শীত। ঠিক এই সময় ময়দান ঋতুমতী হয়। অন্য সময় ময়দান বন্ধ্যা বন্ধ্যা। □

শৈনিক রায়

খন্ড চালচিত্রে মফস্বলের শীত



টিফিন পিরিয়ডে স্কুলের মাঠে এসে দাঁড়ালো রণবীর। কিছুক্ষণের মধ্যেই সঞ্জয়, অধীর, নাসির এসে পড়বে। তারপর হৈ হৈ ছুট। দুপুরের রোদ্দুরটা বেশ মিঠে লাগল রণবীরের। নীল আকাশে হালকা মেঘ। দেবদারু গাছের ফাঁক দিয়ে বয়ে আসা হিমেল বাতাস রণবীরের লোমকূপে শিরশিরানি ধরিয়ে দিল। নভেম্বরের একুশ। অধীর-সঞ্জয়রা এসে পড়তেই, গেট পেরিয়ে, বড় রাস্তায় বুড়োদার লজেন্স-বিস্কুটের দোকানে হাজির। বয়ামের দিকে চোখ মেলতেই দেখল রোলক্রিম বিস্কুট। শীতের এই সময়টায় শহরের দোকানগুলোতে এই বিস্কুটই জানান দেয় শীত আসছে।

এভাবেই শীত এসে যায় রণবীরের শহরে। চোখের সামনে ভেসে ওঠে বারান্দায় রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে ছোট পিসি রঙচঙা সোয়েটার বুনছে ওর জন্য। বাবা বাজার থেকে আনছেন শিশির ভেজা ফুলকপি, সিম, টম্যাটো, পালংশাক। দুর্গাঠাকুর বিসর্জনের পর থেকেই কিংবা কালীঠাকুর জলে ফেলার পর থেকেই ভোরবেলায় হালকা কুয়াশায় ছেয়ে যায় দিগন্ত। মা গায়ের ওপর পাতলা কম্বল ফেলে দেন। রণবীর কম্বল জড়িয়ে অনুভব করে সূর্য



উঠবে আরেকটু পরে।

ঠিক রণবীরের মতই, আমাদের শরীরেও শীতের বাতাস জানান দেয় – 'আমি এসে গেছি।' মনের ভেতর উঁকি দেয় সেই বৈরাগীর মুখ – আর সে প্রভাতী গান গাইবে না বাড়ির জানলায়।

৫ ডিসেম্বর

ফুটপাথের দোকানগুলো আপাতত শৌখিন শাড়িগুলো তুলে রেখেছে। বদলে টাঙিয়েছে নানারঙের চাদর, বাচ্চাদের গরম জামা। সুবীর আর মান্তু বাচ্চাটাকে আষ্টেপৃষ্ঠে সোয়েটার-টুপি-জুতোমোজায় মুড়ে রাস্তায় বেরিয়েছে। জজ কোর্টের মোড়ে আসতেই নজরে পড়ল সোনাদার দোকানে নীল কাপড়ে সাদা রঙে লেখা কড়াইশুঁটির কচুরী ও নলেন গুড়ের সন্দেশ। মান্তু বলল, 'চলো বাবাইয়ের জন্যে সন্দেশ নিয়ে নিই।'

শহরের রাস্তায় নারী পুরুষের সংখ্যা কম নয়। কর্কট ক্রান্তির সীমানা ঘেঁসা এই শহরটায় শীত একটু আগেই আসে, বেশিই পড়ে। শরীরে শরীরে রঙের ফুলঝুরি। একটু এগোতেই রাস্তার ধার ঘেঁসে ছোট মঞ্চে শুরু হয়েছে শীতকালীন জলসার আসর। দীপক মৈত্র গাইছেন 'এই মাল নিয়ে চিরকাল যত গোলমাল।' মঞ্চের ঠিক পেছনেই দুধের আড়ত। ঘোষেরা বসে আছে ছানা নিয়ে। দরদাম চলছে। একপাশে টায়ার জ্বেলে আগুন করে হাত-পা সেঁকছে ফুটপাথের বাচ্চারা। মান্তু বলল, 'এই ভিখারিটাকে দেখ। এই শীতেও ছেঁড়া জামা –

সুবীর বলল, 'ওরাই জনগণ। প্রতিশ্রুতি পেতে পেতে চামড়া মোটা হয়ে গিয়েছে। শীত লাগে না।'

উলের পোশাকে আপাদমস্তক মুড়ে চাঁদু এসে নামল সাইকেল থেকে। সুবীরের দিকে হাসি বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'এই হারামজাদা রিহার্সালে যাবি না' চটপট সপুত্র মান্তুকে বিদায় দিয়ে চাঁদুর সাইকেলে সওয়ারি হল সুবীর। শীত মানেই নাটকের পোস্টার, রিহার্সাল এবং মাস চারেক প্রায় সব দলের নাটক। কোনো কোনো বছরে এ দৃশ্যের ইতর-বিশেষ ফারাক থাকলেও, শীত শহরের বুকে এনে দেয় নতুন জোয়ার।

১০ ডিসেম্বর

রণবীর এখন যুবক। সদ্য কলেজ পাশ করেছে। কবিতা লেখে। লিটল ম্যাগ বের করে। সকাল সাতটায় ওর ঘুম ভাঙে। এক কাপ চা খেয়ে চাদর জড়িয়ে চলে আসে লেখরাজদার চায়ের দোকানে। ইংরেজি এল প্যাটার্নে সাজানো বেঞ্চগুলোয় শুরু হয়েছে আড্ডা। এক কোণে দুই রবিবাবু প্রভাতী কাগজের খবর নিয়ে শুরু করেছেন তর্ক। সিদ্ধার্থ রায় মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ভাল কি খারাপ। সমাদ্দারদা কল্লোল নাটকের স্টেজ ক্রাফট বোঝাচ্ছেন রেবতীকে। অন্যদিকে সুবীর, শরীক, স্নেহাশিস, মহাদেব, রণবীর জোর আলোচনা করছে ভাস্করের কবিতার বই 'শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা' নিয়ে। মাইকেল এলো মলির পিছু পিছু। মলি এগিয়ে যেতেই সাঁৎ করে দোকানের ভেতর ঢুকে একটা গাঁজাপোরা সিগারেট ধরালো। গৌতমও এসে গেছে গাঁজা ডলতে ডলতে।

দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল শ্যামলী। রণবীর সটান বেরিয়ে গেল। শ্যামলী সোয়েটারের উল কিনবে। রণবীর ওকে সংগ দেবে। কাল বিকেলেই রণবীর ওকে নিয়ে হর্টিকালচারে গিয়েছিল। মরসুমী ফুলের ঝোপে অনেকক্ষণ বসে ছিল। ফুলের গন্ধে প্রেমের গন্ধে দুজনে সন্ধে নামিয়ে এনেছিল শহরে।

১৬ ডিসেম্বর

ঘন্টা বাজছে ক্যাথিড্রালে। শহরের অন্যতম বড় উৎসব বড়দিন সামনেই। মাত্র সপ্তাহখানেকের দেরি। খ্রিশ্চান পরিবারের গৃহকর্তা-কর্ত্রীরা সওদা শুরু করেছেন। পোশাক-আশাক থেকে কেক-পেসট্রির মশলা জোগাড়। শীত পড়েছে ঠকঠকিয়ে। মিউনিসিপ্যালিটির মোড়ে দিশি মদের ঠেকে ভিড় জমছে — ভিড়। গুরু ট্রেনিং স্কুলের মাঠে হেরিকেন জ্বালিয়ে মাদুর বিছিয়ে, চাদর-কম্বল মাথা ঢেকে চলছে ব্রিজের আসর কিংবা তিন পাত্তি। তবে এ আসর চলবে বড়জোর রাত আটটা অবধি। গরমকালের মত রাত বারোটা বাজে না। কেন না, রাত আটটা বাজলেই রাস্তা শুনসান। দোতলার জানালায় নীল আলো জ্বলে ওঠে। জানালা বন্ধ হয়। অদূরে শীতের ঠেঙানিতে কুকুর কেঁদে ওঠে।

২১ ডিসেম্বর

ভোর ছটায় অমলা মাসি রাস্তায় বেরিয়েছে। সাত বাড়ি ঠিকে ঝি-য়ের কাজ। সরু পাড় আধময়লা শাড়ির তেলচিটে সাবেকি চাদর। মাঝে মাঝে ফুটো হয়ে গিয়েছে। পায়ে ক্ষয়ে যাওয়া সস্তা রাবারের চটি।

— 'কি গো মাসি শীত পড়েছে?'

দরজা দিয়ে ঢুকতেই সুতপার গলার আওয়াজ পেল। অমলা মাসি বলল — 'বড্ড জার গো। হাড় কাঁপিয়ে দিল।' রান্নাঘরের এঁটো বাসন বের করে কলতলায় ডাঁই করল। বালতিতে রাখা বাসি জলে হাত চোবাতেই মনে হল হাতের পাঞ্জা বুঝি খসে গেল। দাঁতে দাঁত চেপে অমলামাসি জল ঢালল। বাসন ধুলো। ঘর মুছতে এসে দেখল ছেলেমেয়েরা লেপের নিচে টুকি খেলছে। তাকিয়ে রইল অমলামাসি। কী হৃষ্টপুষ্ট চেহারা! নিজের ছেলেটার কথা মনে পড়ল। হাফ প্যান্ট আর গেঞ্জি গায়ে গেছে রাজমিস্ত্রির জোগাড়ে হয়ে। চাদর বলতে পাতলা একখান গামছা। কাজ করার সময় ওটাই পাগড়ি হবে। চটপট হাত চালালো অমলামাসি। পরের বাড়ি যেতে হবে। গরম জল করতে হবে। গোসল করবেন দিদিমণি।

২৯ ডিসেম্বর

পৌষের দ্বিতীয় সপ্তাহ। গত পরশু 'হালকা থেকে মাঝারি ধরনের' বৃষ্টিপাত হওয়ায় শীতে মোষের শিং নড়ছে। কর্কটক্রান্তি এলাকায় সকালের কুয়াশা যেন তুষার। বন্ধ দরজা জানালার চেরা ফাঁক দিয়ে যেটুকু হিম ঘরে ঢোকে, লেপের ভেতর থেকে মুখ বের করলেই সেই হিম ঠাস করে চড় মারে। তবুও শান্তিলতাকে উঠতে হয় ভোর পাঁচটায়। স্বামী কেষ্টনগর লোকাল ধরে শিয়ালদায় যাবে চাকরি করতে। সকাল সাড়ে সাতটায় গাড়ি। শান্তিলতা উঠে চা করে, সেই স্টোভেই ভাত বসিয়ে দেয়। ভাত, আলুসেদ্ধ আর একটা ভাজা। এই করতেই ছটা। কমলাক্ষ ঠিক সাড়ে ছটায় খেতে বসবে। সেও পাঁচটায় ওঠে। বাসি পেটে এক কাপ চা খেয়ে, তেল মাখতে বসে। গুনগুন করে গান গায় আর বুকে তেল ঘসে। যেন গান গাইলেই শীত পালাবে। তারপর পাড়া জানান দিয়ে মুখে নানারকম শব্দ করে স্নান করে। সবই শীত তাড়ানোর মন্ত্র। সাতটায় কমলাক্ষ বেরিয়ে গেলে শান্তিলতা একটু বসে। চাদরটাকে পায়ের ওপর টেনে একটু বিশ্রাম নেবার চেষ্টা করে। চোখ এঁটে আসে। ঘাড় হেলে পড়তে চায়। শরীর ভার ভার লাগে। মনে হয় আরেকটু ঘুমিয়ে নিলে শরীরটা ঝরঝরে হবে। কাল রাতে ট্রেন লেট ছিল। স্বামীর ফিরতে রাত এগারোটা বেজে গিয়েছিল। অত রাত অবধি সে ঠায় বসেছিল বারান্দায়। মশা মারতে মারতে কত কী কু ভেবেছে। ছেলেমেয়েরা তখন ঘুমিয়ে কাদা। স্বামী ফেরার পর কাজ সেরে শুতে শুতে রাত বারোটা বেজে গেছে। তখন শরীরে আর শরীর নেই।

ঘুমের চটক ভেঙে উঠে বসল শান্তিলতা। ছেলেমেয়েদের ইস্কুল আছে। গায়ের চাদর খুলে রেখে আঁচল জড়িয়ে নিল গায়ে। ঝাঁটা হাতে নেমে পড়ল উঠোনে।

৩ জানুয়ারি

— খেজুর রস। চাই খেজুর রস।
কত করে?
— চার আনা গেলাস।
— ভাল হবে তো?
জিরেন কাটের রস বাবু।
— দু-গ্লাস দাও।

হাঁটুর ওপর ধুতি পরা, খদ্দরের সস্তা চাদর গায়ে রোজ সকালে খেজুর রস দিয়ে যায় আমাদের। জিরেন কাটের রস বড় মিঠে। আহা কী স্বাদ। প্রতি বছর শীত পড়তেই চলে আসে বাড়ির দরজায়। টানা ফেব্রুয়ারি মাস। সন্ধেবেলায় এক লম্বা ছুটে জমিদারের বাগানে ঢুকে যাই আমরা। পটাপট হাঁড়ি পেড়ে রস বোঝাই করে নিই একটা হাঁড়িতে। তারপর চোঁ চোঁ। দুপুর বেলায় সেই লোকটা আসে। পন্ডিতপুর থেকে। নতুন খেজুর গুড়। নাগরি ভর্তি গুড় নিয়ে এসে হাঁক দেয় — 'মা গুড়'। বাস আর কিচ্ছু না। মায়ের পিছু পিছু আমরাও গিয়ে হাজির। বিকেলে তিলেখাজা। চিনির কিংবা গুড়ের। দশ পয়সার তিলে খাজা নিয়ে আঙুল চাটতে চাটতে চলে যাই খেলার মাঠের দিকে। বড়রা ক্রিকেট খেলে। ভলিবল খেলে। মেয়েরা রিং খেলে। কানামাছি খেলে। আমরা বল কুড়িয়ে দিই। 'রান প্র্যাকটিশ' করি। কিংবা



লুকোচুরি।

১৬ জানুয়ারি

সবে মাঘ পড়ল। কাল পৌষ সংক্রান্তি ছিল। পিঠে পুলির পেটগরম এখনো রয়ে গেছে। সক্কাল বেলায় শঙ্করের ঠাকমা পুকুর থেকে স্নান করে ফিরছে। স্নান করে সারা রাস্তা বিড় বিড় করতে করতে যাবে বুড়ি। গায়ে রোদ পড়ে তেরছা ছায়া তৈরি হয়েছে মাটিতে। খুব লোকজন এড়িয়ে চলে বুড়ি। কারো স্পর্শ তো দূরে থাক, কেউ ওর ছায়া মাড়ালেই আবার স্নান করবে। রণবীরের মাথায় দুষ্টু বুদ্ধি খেলল। বুড়ি কাছে এগিয়ে আসতেই 'কেমন আছো ঠাকমা' বলে ছায়ার ওপর দাঁড়ালো। চেঁচিয়ে উঠল বুড়ি – 'তোর মুখে কালি, যমের বাড়ি যা, ডাকরা ছোঁড়া' ইত্যাদি ইত্যাদি এবং ফিরে চলল পুকুরের দিকে।

১৬ ফেব্রুয়ারি

শীত এখন শেষের দিকে। রণবীর এখন প্রৌঢ়। এবার শীতে হাঁপের টানটা একটু বেগ দিয়েছে। উঠোনে ইজিচেয়ারটা পেতে চাদর গায়ে দিয়ে রণবীর, রিটায়ার্ড কেরানি, রোদের দিকে তাকাল। ভাবল, শীতটা ছিল তবু দুটো টাটকা আনাজ খেতে পেতাম। সস্তায় চারটে মাছ খেলাম। আবার গরম পড়বে। ধরিত্রীর শরীরে টান ধরবে। মাটি ফাটবে। জিনিসের দামও আকাশ-ছোঁয়া হবে। আমরা মফস্বলের হাভাতে মানুষ। আমাদের শীতই ভাল। শীত এলে দুটো টাটকা সব্জি খাওয়া যায়। হ্যাঁ, একটু কষ্ট পাই ঠান্ডায়। তবু কত মনোরম। কী মিঠে রোদ। মফস্বল তো আর কলকাতা নয়। এখানে বাড়ির জানালায় বসেই আকাশ দেখা যায়। যদিও শহরটা ঘিঞ্জি হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। তবু কলসায় ঘা হলে সকালের দুব্বোঘাসের ডগা থেকে শিশির তুলে লাগিয়ে দিলে সেরে যায়। এখনো শহরের আনাচে-কানাচে সিজন ফ্লাওয়ার ফোটে। সকালে কুয়াশা ছিঁড়ে যখন রোদ ঢোকে শহরে, তখন কী মধুর, মধুর মনে হয়। এত বয়সেও তখন পূরবীকে দু বাহুতে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করে। শীত, আহা! কী এক উন্মনা করা দুপুর। বিবাগী মানুষের জন্যে হাহাকার করতে ইচ্ছে হয়। শরীরের ভেতরে ওম। মনের ভেতরে ওম। ঝরাপাতার ব্যথা উপেক্ষা করেও মানুষের মুখে সরল হাসি খেলে যায়। আহা! শীত আসুক। আবার আসুক। রণবীর একটা দীর্ঘশ্বাস টানে। গলা বাড়িয়ে বলে 'পূরবী এক কাপ চা দেওন যাইবো?' □

সমরেন্দ্র মণ্ডল

গ্রামের শীত গরিবের কাছে বিছের কামড়



সুখ স্বস্তির ছোঁয়া পাওয়া মানুষ মাত্রই বলে থাকে বা বলতে ভালওবাসে যে শীত ঋতু বা শীতকাল দারুণ ভাল। দারুণ সুন্দর। যেমন মজা তেমন আমেজ। খেয়ে খাইয়ে বেড়িয়ে ঘুরে আর কত কি করে। শীতকাল ভোগ আর উপভোগের মহিলাদের কাছে ভীষণ আনন্দের এই শীতে বেশ মজা সুন্দর করে সেজে। কারণ প্যাচ-প্যাচে ঘামে যেমন সাজ নষ্ট হয়েও যায় না – তেমনি যত রকম পোশাক আছে শখের ভান্ডারে এ সবই বেশ গায়ে চাপানো যায়। খেতে ভাল লাগে না, একথাও বলতে হয় না নিম খাবার মত মুখ করে। বাজারে অনেক সবজি টাটকা মেজাজে। দামেও সস্তা বলা যায়। বানাও না নিত্য নতুন খাবার। প্রশংসার সঙ্গে স্বাদের নতুনত্ব মানুষের নিজ রসনার কাছে আজও ম্লান হয়ে যায়নি।

শীত এলেই তাই খুশীর হাওয়া। ছোটবড় কচি কাঁচা কিশোর-কিশোরী তরুণ তরুণী সকলেই বেরিয়ে পড়ে বেশ একটা নিয়ম করে (বিশেষ করে কলকাতায়) মাঠে ময়দানে চিড়িয়াখানায় ভিক্টোরিয়ায় আরো কত জায়গায়। গায়ে নতুন সোয়েটার শাল-টুপি-জাম্পার স্কার্ফ। পশম রঙের রোশনাই শরীরে ও মনে। মেজাজটা থাকে হালকা। অফিসে কাজ করেও বোধহয় তৃপ্তি, কারণ লোডশেডিং হলেও মেজাজ তিরিক্ষি হয় না। জানালার ফাঁক দিয়ে আসা শীতের মিঠে রোদ কেমন আদর করে যায় কাজের ফাঁকে।



ফটো : সুবীর মণ্ডল

একটু উষ্ণতার জন্যে

বাড়িতেও বাজার খাওয়া নিয়ে হয় না রুটিন-মাফিক অশান্তি। রাতে ঘুমোও রোদ খাওয়া নরম অথচ সুন্দর গরম লেপের তলায়। দুচোখে থাকে স্বপ্ন। ক্লান্তিরা তো শীতের ছোঁয়ায় পালিয়ে বাঁচে। কি সুন্দর একটা ঘুম। ভালবাসা আদর সবই যেন বেশি বেশি। শীত যেন সোহাগী।

এ সব অনুভূতিই বেশিটা কাজ করে শহরের কোলাহলে জীবনের অনন্য চলার গতিতে। দুঃখ কি শহরে নেই? আছে। ফুটপাতে-ঝুপড়িতে। তবে তার সংখ্যা ওই বিশাল শহুরে জীবন গদোর মিছিলের কাছে জিরো পাওয়ারের মতই অস্পষ্ট এক উপস্থিতি। গোপাল ভাঁড়ের গল্পের মত যদি রাস্তার আলোর উত্তাপে শরীর কিছুটা গরমের সুযোগ পায় ফুটপাতবাসীর জীবন – তবে তেমন সুযোগের ছিটে ফোঁটাও কিন্তু গাঁয়ের দুঃখী মানুষগুলো পায় না। ওদের কুঁড়ের পাশে থাকে না কোনো অহংকারী অট্টালিকা যা শীত সোহাগীর পাগল হাওয়ার আঁচলকে আড়াল করতে পারে কাঁপুনির হাত থেকে। বেশি দূর নয় কলকাতা থেকে ৪০ কিলোমিটার দূরত্বের কিছু গাঁয়ের প্রগতি বিচ্ছিন্ন দু-একটা ঘটনার কথায় আসা যাক। দু-একটি দুঃখী মানুষের শীতকালীন জীবনযাপনের কথায়। ওদের ভাষায় জানা যাক না ওদের জীবনে শীত কেমন?

দুলে বউ-এর সঙ্গে দেখা হল পড়ন্ত বেলায়। ঘোষেদের বাড়ি থেকে খড় কেটে মাঝমাঠ দিয়ে আল ধরে হেঁটে আসছিল। কোলে ছিল ছাগল বাচ্চা। সাধ করে নাম রেখেছে পরী। বড্ড

সাদা। হঠাৎ ওকে ডাকছি দেখে থমকে দাঁড়ায়। মনে হল যেন কলকাতায় ছুটে যাওয়া এক্সপ্রেস হঠাৎ ব্রেক কষেছে চেকপোস্টের কাছাকাছি এসে। ছেঁড়া শাড়িটা দিয়ে কোনো রকমে তার গর্ভের জয়ঢাক ঢাকতে চেষ্টা করে। ভয় দিদিমণি হয়তো এক্ষুনি বলবে – 'এ বছরেও আবার ' উঃ তোমাদের যে কবে বুদ্ধি হবে' না: সে কথা নয়। প্রশ্ন এল 'শীত কেমন লাগছে গো ?' সদ্য কলেজে যাওয়া কিশোরীরা যেমন ভিড়বাসেও বিনা কারণে খিলখিল করে হেসে এ ওর গায়ে গড়িয়ে পড়ে, ঠিক তেমনি করেই পঁচিশের দুলে বউ হেসে উঠল। হাসতে হাসতেই অঘ্রাণের ধানের শিষ ছিঁড়ে দাঁত দিয়ে কেটে ধান-দুধটা চুষে খেল। তারপর কোলের পরীর মাথায় হাত বুলিয়ে বলে উঠল 'দিদিমণি, শীত মানে তো বিছের কামড় গো ! আত হলেই ভয় নাগে ! কাঁথা কানি তো তেমন নাই। বড় খোকার (তার নিজের বড় ছেলে) বাপ আমার হাড় কটাই বুঝি খুলে নেয় ' বড্ড জ্বালা গো ' মদের গন্ধে এমনি বমি আসে যে মনে হয় পেটের শয়তানটা মুখ দিয়েই উঠে আসবে ' তুমি এমন মসকরা কেন করো গো দিদি

দুলে বউয়ের চোখ দুটো জলে ভরে ওঠে। ছুটে পালায়। যেতে যেতেই বলে 'এই বেলা ঘর যাও নইলে শীতভূত আসবে গো অবিশ্যি তোমার শাল আছে।' দুলে বউয়ের কথাতেই ছিল দুঃখের শাল যা বিঁধিয়ে দিয়ে অতি সহজেই প্রশ্ন তোলে ভাবনার ঘরে দোষ কার শীতের না কি ?

ফিরে আসছি। মাঠ ছেড়ে এবার পথে। দেখা হয়ে যায় পুরকাইতদের বউ জটাইবালার সংগে। আদুর গায়ে কো-অপারেটিভ-এর ১৫ টাকা ৫০ পঃ হলুদ-ডুরে শাড়ি বেশ গুছিয়ে পরেছে। এ শাড়িগুলো বেশ মোটা। সায়া না পরলেও চলে। তবে কি পায়ে পায়ে জড়িয়ে যায়। ছুটতে অসুবিধে। হাতে ছিল তার কয়েক আঁটি খড়। জিগ্যেস করলাম 'খড় কী হবে গো ? তোমার তো গরু নেই ? বিড়ে বাঁধবে নাকি কলসী রাখার জন্য ? ' করুণ মুখটাকে আরো করুণ করে বলে ওঠে – 'না দিদিমণি, বিড়ে বাঁধবুনি। নিচ্ছি ঘরে পাতবার তরে ! গায়েনদের থিকে চেয়ে আনলুম। নিজের তো জমি নেই। ওরা ভাল। ফি-বছর শীতে আমায় ক-আঁটি করে খড় দেয়। জলার ধারে ঘর। মাঠ এখনো ভিজে তাই আমার ঘরও বড় স্যাঁতস্যাঁতে। যেন নিচ থেকে জল উঠছে। তুমিই বলো দিদি, ৬টা ছেলে নিয়ে ঐ টিবি রোগী (স্বামী) মানুষটাকে নিয়ে কেমন করে শীতটা কাটাই ? ঘরে তো বিছানা বলে কিছু নেই ! তাই এই খড়গুলো আগে মাটিতে বিছিয়ে দেব তারপর দুটো বড় বস্তা জুড়ে একটা বড় চাদর করেছি তাই উপরে পেতে দেব। কাঁথা-কানি যেটুকু আছে তা সবাইকেই গায়ে দিতে হবে। ৭টা-৮টা মানুষ কুঁদোকুঁদি করে শোব এ ওর গায়ে ঠ্যাঙ তুলে দিয়ে। গায়ের গরমে আবার সব গরম হয়ে যাবে। নিচেও খড় থাকবে। ঠান্ডাটা অত মালুম হবে না। বাঁচতে তো হবে দিদি ! তিনটে মাস কাটাতে পারলে রেহাই। তবুও ভয় নাগে দিদি, যদি কারো নিমোনি (নিমোনিয়া) হয় তবে কি করবো ?'

শীতটা এখনো জাঁকিয়ে পড়েনি। তবুও ওরা বসে গেছে চোলাই-এর গেলাস পাশে রেখে কাঠকুটো জেলে আগুন পোহাতে রাত না হতেই। অবশ্য শহরের চেয়ে গ্রামে শীতটা বেশ বেশিই মালুম হয়। ওরা সবাই আগুন পোহাচ্ছিল। আগুনের লকলকে শিখায় ওদের সকলের মুখে যে যন্ত্রণার ছবি ফুটে উঠেছিল তা কি শুধু শীতের ছবি ? নাকি জীবনযন্ত্রণার কথাই ঘোষণা করছিল নীরব প্রতিবাদের ভঙ্গিতে। ব্যাংগ ছিল কিনা ওদের দৃষ্টিতে তার সঠিক ব্যাখ্যা করতে পারে বোধহয় কোনো দার্শনিক।

আচ্ছন্ন হয়ে দাঁড়িয়ে আছি বাসের অপেক্ষায়। আসবে বারুইপুর থেকে। যেতে হবে আমতলা। চারিদিকটা বেশ অন্ধকার। লোডশেডিং। চা-দোকানে জ্বলছে কেরোসিনের কুপি। হঠাৎ পাঁচ ব্যাটারির টর্চের আলো পড়ল মুখের ওপরে। একটু ভয় পেলাম। তাকিয়ে দেখি সামনে দাঁড়িয়ে শাকিলা, সাবিনা, মঞ্জুলা ও তসমিনা। ওরা সবাই আমতলায় কালীঠাকুর দেখতে গিয়েছিল। আমতলার কালী ঠাকুর স্যাতদিন ধরে থাকে। আমাকে দেখে অবাক। 'হাই দিদিমণি ? তুমি ? কতখুন এয়েছো ? মোরা সব তো তোমাদের দেশে গিয়েছিলুম গো ? বলি চাদর গায়ে দাওনি কেন ? ঠান্ডা লাগবে যে ?'

বললাম – 'তোরাও তো কিছু গায়ে দিসনি ?' ওরা সবাই সমস্বরে বলে উঠল – 'হাই দেখো, মোদের নাকি আবার জার লাগে ! বলি ধুপের দিনেও (খুব রোদের সময়) মোদের ছাতা লাগে নে আবার জারের দিনেও লাগে নে কাঁথা। মোরা তো সব অজন্মা ! জারের বেলায় তো তুমাদের সাজবার দিন গো। কতসব রকম রকম সোয়টার (সোয়েটার) পিন্দবে (পরবে), শাল পিন্দবে আবার পিকনিক করবে ' মোরা সব তুমাদের দেখবো !'

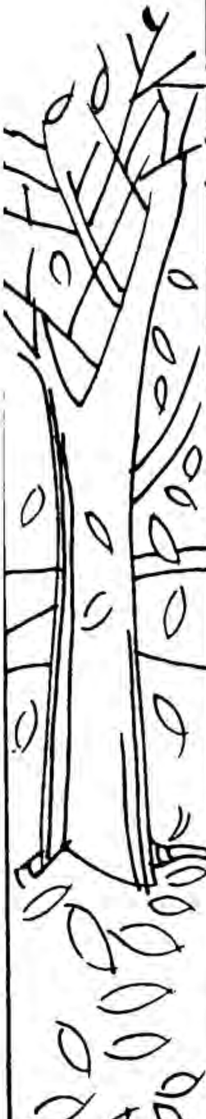
দলের মধ্যে তসমিনাই কথাগুলো বলে ওঠে। ও চিরদিনই একটু বেশি চটপটে। দুঃখের কথা যন্ত্রণার কথা হেসে বলতেই পছন্দ করে। ওর একটাই মেয়ে। মেয়ে যখন পাঁচ মাসের পেটে তখন স্বামী ছেড়ে দিয়েছে। সেই স্বামী আবার বিয়ে করেছে। কারণ পণ। কথা ছিল মেয়ের কানবালা, জামাইকে সাইকেল, ৫ খানা দানের বাসন ও একটা লেপ দেবে বিয়ের ৬ মাস পরে জারের বেলায়। বে হয়েছিল আষাঢ়ের শেষে। তসমিনার বাবা রশিদচাচা কথা রাখতে পারেনি। যে মেয়ের বাপ কথা রাখতে জানে না সে মেয়ে কখনো ভাল হতে পারে না। অতএব বাপের ঘরে যাও। তসমিনা তালাক পায়নি। ভাইয়েরা চেয়েছিল আর কিছু না হোক বোনকে একটা ভাল লেপ দিয়ে শ্বশুর বাড়ি পাঠাতে। বোন তসমিনা যায়নি। বলেছে... 'ওই লেপের নিচে তোর বোনাইয়ের কাছে শুলে মোর গা কুটোবে ভাই। তার চেয়ে এই তোদের ঘরে খড়ের বেছনায় শোয়া ঢের ভাল ! ওর দিলে (মন) পেয়ার বলে কিছু নেই ! মুই বরং প্যাটের শত্তুরটাকে মানুষ করি.

তসমিনার মেয়ে হামিদা এখন বছর পাঁচেকের। গাঁয়ের ইসকুলে পাততাড়ি পড়ে। অবশ্য হামিদার একটা সোয়েটার আছে। গাঁয়ের চাচাতো ভাই সোলেমান মদের পয়সার জন্য তসমিনার কাছে তার মেয়ের সোয়েটারটা বন্ধক রেখেছিল আর ছাড়াতে পারেনি। তাই সোয়েটারটা এখন হামিদার। তসমিনা কাপড়ে জরির কাজ করে ভাইদের সংসারে কিছু পয়সা দেয়। শীত এলেই মনে পড়ে যায় শ্বশুরবাড়ির কথা। ভরা পৌষে ঝমঝমে পানি পড়ার দিনে ; হামিদার বাপ ভর সন্ধেবেলায় তাড়িয়ে দিয়ে বলেছিল 'তোর চিটিংবাজ বাপের ঘরে আগে যা। সব কটা জিনিস – এট্টা লাল শালু কাপুড়ের ভাল পদ্মছাঁট লেপ নিয়ে তবে ভিটেয় ঢুকবি... নইলে !' তসমিনা যায়নি। শীতের দিনের কথায় গাঁয়ের মানুষের কাছ থেকে যে জীবন পাঁচালি উঠে আসে তা বড় কষ্টের ! বড় যন্ত্রণার ! ওদের সংগে দেখা হলে গায়ের শাল যেন শাসন করে ভেতরের মনটাকে – কেন এমন হয় ?

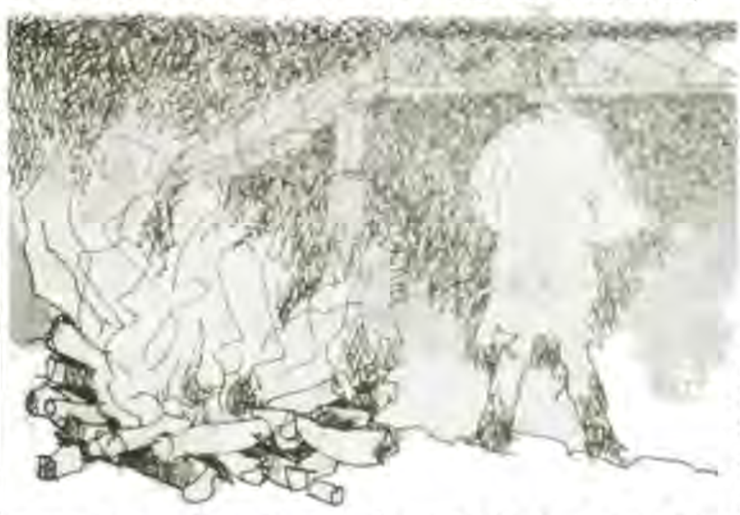
চন্দ্রা মিত্র



বড় শীত হে, অনুপম



'বড় শীত হে, অনুপম। দেখছ না – প্রাগৈতিহাসিক ভস্মের মতো শীত নিষ্করুণ বৈরাগ্যে কেমন ছড়িয়ে আছে চরাচরে ? রেশম-তনু রাতে কেমন লেপ্টে আছে বিষাদ ?' কোনো কোনো শীতের রাতে 'অনুপম ত্রিবেদীর মুখ জেগে ওঠে'। – আর লোকটা তখন এসব কথা নিজেকেই বলে ফিসফিসিয়ে। ওর মনে হয় 'শিশিরের বালাপোশে অপরূপ শীতে' সবাই এখন 'ঘুমায়ে আছে'। অনেক চিন্তা অসংলগ্ন হয়ে লোকটার মাথায় তখন হিমায়িত হতে থাকে। ওর ইচ্ছে জাগে জোছনায় মাখামাখি হয়ে তুষার ঝরুক ঝিরঝিরিয়ে। স্বচ্ছ কাচের শরীরে পাল্টে যাক ওর ঘরের দেওয়াল। আর তাতে গাল ঠেকিয়ে ও রাতভর প্রত্যক্ষ করুক বাইরের সেই হিমেল তামাশা।



ছবি : অনুপ চক্রবর্তী

লোকটা যখন ছেলে ছিল অমায়িক রিক্ততায় তখন ওকে ভরিয়ে তুলত শীত। কখন যেন বিকেল নিস্তেজ হয়ে যেত সন্ধ্যার আচমকা হানায়। বাড়ি ফেরার পথে অশ্বত্থ ও বাবলা গাছ থেকে ঝুপ ঝুপ করে লাফিয়ে নামত অন্ধকার। রাত বাড়ার সংগে সংগে আস্তে আস্তে বদলে যেত চারধার। কাছের বেতস বন ও ফণীমনসার ঝোপঝাড় থেকে ভেসে আসত সব অনৈসর্গিক আওয়াজ। ক্রমে ভারী হয়ে নামত লণ্ঠনের আলো। ঠান্ডায় হি হি শরীর শান্ত হয়ে আসত লেপের ওমে। রাত গাঢ় হত। ঘুম আসত না ছেলেটার।

ও ঠিক জানে সারা দিনের চেনা মাঠটা এখন আর তেমন সবুজ নেই। কারা যেন তার উপর দিয়ে এখন মার্চ করে চলেছে। তাদের দেহ পাটকিলে রঙের। চোখ সবুজ। আর প্রত্যেকের মাথার ঠিক দু-ইঞ্চি উপরে এক একটা টুপি স্থির লটকে আছে হাওয়ায়। নির্ঘাত এখন দিক বদল করেছে গাছগুলো। ওদের শরীর থেকে ঠিকরানো শীতল রহস্য এখন চরাচরে নেচে বেড়াচ্ছে আলেয়ার মতো। আদিম হিমে বিবশ হয়ে আছে কচুবন। পাশের ডোবার ব্যাঙেরা এতক্ষণে জেগে উঠছে রূপকথার রাজপুত্রের মতো।

মাঝ রাতে গাড়ির ঘণ্টা বাজে স্টেশনে। সফেন তরংগের মতো টুকরো টুকরো হয়ে তা এক সময়ে বিকিয়ে যায় নির্জনতায়। ছেলেটা জানে শুধু এক হলুদ রঙের হাত ভেসে এসে বাজিয়ে দেয় ঘণ্টা। যে বাজায় তার প্যাকাটির মতো দেহ – চোখ নেই, মুখ নেই, মাথা নেই। গোটা তিনেক চারকোনা ছোট্ট লণ্ঠন হেঁয়ালির মতো অন্ধকার ছড়ায়। শীতের ছোবলে রাতের মায়াবী হুলিয়ায় এখন ঝিম মেরে আছে প্ল্যাটফর্ম। কারা যায় এই ঠান্ডায় রাতের ট্রেনে   তারা সব জানলার ধারে বসে বই পড়ে তাদের মাথায় টুপি   গলবন্ধ কোট ব্রিজের উপর দিয়ে যখন গুমগুমিয়ে চলে গাড়ি, তারা সব ঝুঁকে তাকায় নিচে অবসন্নতায় ঝিমিয়ে আসে তাদের চোখ ? বইয়ে দেখা এক পেংগুইন পাখি ছেলেটার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। পাখিটা ক্রমে বড় হতে হতে এক বিশাল দানবের রূপ নেয়। এক তুষার প্রাসাদের অলিন্দে বসে সে নিরন্তর ডানা ঝাপটায়। আর তার ডানা থেকে উত্থিত হিম খাড়া বল্লমের নৃশংসতায় হিস. হিস করে ছড়িয়ে পড়ে শূন্যে। আর এসব ভাবতে ভাবতে ভারী পর্দার মতো তার চোখ নেমে আসে ঘুমে।

এক এক দিন শেষ রাতে ক্ষণেক বিরতির মতো সে উঠত জেগে। কারা যেন টহল দিয়ে ফিরছে। তাদের খড়মের খটাখট মিলিয়ে যেত এ বাড়ি থেকে সে বাড়ি। ঘুমকাতুরে চোখে ছেলেটা পাশ ফিরে শুত। হাতটা লেপ-গন্ডীর একটু এদিক ওদিক হলেই ঠান্ডা ছোবল। যেন কেউ ছাদ ফুটো করে এক পোঁচ হিম ছড়িয়ে গেছে বিছানার এধারে। কোনো কোনো দিন সে চুপি চুপি দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ত। বিহ্বলতার মতো ঘন নিরেট কুয়াশায় ডুবে আছে চারধার। ছেলেটা বার বার চোখ কচলে চাইত কারা মার্চ করে চলে সারারাত   আজ সে দেখবে। ভোরের অবসন্নতায় তারা কী কুহকের মতো মিলিয়ে গেল ! আর একটু বেলা হলে সে দেখতে পেত নিরুচ্চার প্রার্থনা হয়ে এগিয়ে চলেছে শওকত। কুয়াশায় পিঠ ঠেকিয়ে খেজুর গাছ থেকে টেনে নামাচ্ছে টইটম্বুর হাঁড়ি।

জামরুল গাছের ফাঁক দিয়ে দাওয়ায় জাফরি কাটত প্রথম সকালের রোদ। ঘুম ভেঙে ছেলেটা ছুটে যেত বাগানে। এ এক আশ্চর্য সকাল। কখন যেন সূর্যের দীপ্ত হাত এক ঝটকায় সরিয়ে দিয়েছে কুয়াশার আবরণ। হলুদ গাছে সহজ বিস্ময়ের মতো কয়েক ফোঁটা টলটলে শিশির। কাল সারা রাত ধরে চলেছে অশরীরী উৎসব। এখন সূর্যের খর হাত তার সব নিদর্শন মুছে ফেলতে ব্যস্ত। শুধু পুরু শ্যাওলা-জমা কলতলায় এক রাশ ছাই ডাঁই করা। তার উপরে নানা গাছপালার নিবিড় জড়াজড়ি। ওখানে দিনভর থমথমিয়ে আছে শীত   ওদিকে তাকালেই সান্ত্বনার মতো ভয় এসে জড়িয়ে ধরত ছেলেটাকে।

লোকটা তখন সদ্য কৈশোর ছাড়িয়েছে। মুগ্ধতার আলো তখনও সবটুকু মরে যায়নি ওর মন থেকে। শীতের ভরন্ত রাত। নিভন্ত চিতা থেকে তখনও ধোঁয়া বেরুচ্ছে অল্প অল্প। রমণোন্মুখ রমণীর শৃংগার বিলাসের মতো চাঁদ খিল খিল করছে নদীর বুকে। কই ? কোনো বিহ্বল আলোড়ন নেই তো ? কোথায় 'নম্র নীল' জ্যোৎস্নায় বুনো হাঁসের ওড়াউড়ি ? শীতের স্থবিরতার ফাঁসে হাঁসফাঁস করছে রাত। নিবু নিবু চিতার শিয়রে দাঁড়িয়ে মৃত্যু – মুখে ধূসর হাসি। ফসল-কাটা বেআব্রু মাঠে এখন খালি মেঠো ইঁদুরের আয়োজন। ভর্ৎসনার মতো জব্দ হয়ে আছে সব

পেল্লাই গাছ। আদিগন্ত অন্ধকারে পুড়ে ছাই হচ্ছে সাইবেরিয়া। সারা পৃথিবী এক নির্মম ধ্বংসাবশেষ। আর চারদিক থেকে প্রাগৈতিহাসিক হাওয়া হিমেল স্ফূর্তিতে ছুটে আসছে সাঁই সাঁই বেগে। নদীর জলে নামতে বড় ভয় হল তার। সেদিন থেকে শীতের ঘুণ জমতে শুরু করল তার হাড়ে।

শীতের রাত কখনও অবসন্ন কখনও বা তাজা। লোকটা উঠে আর এক গ্রাস জল খেল ঢক ঢক করে। চোখ আটকে গেল খোলা খাতায় তার অসমাপ্ত গল্পের দিকে। 'ভাংগা বেড়ার ফাঁক দিয়ে হিম ঢোকে হু হু করে। গুরুপদ আরও নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে বউকে। পরস্পর ওম খোঁজে শরীরে। সকাল হতে এই ফুটো বেয়েই ঘরময় আঁকিবুঁকি করবে কত রোদ। গুরুপদ এসব ভাবে আর শরীরে শরীর ভাসে সকালের স্বপ্নে।' লোকটা হঠাৎ শুনতে পায় দূরাগত রুট মার্চের শব্দ। শীতের দীর্ঘ রাত নিষ্পত্র গাছের মতো যেন চেয়ে থাকে তার দিকে। সে দেখতে পায় এক নিবু নিবু চিতা থেকে গলগলানো ধোঁয়া সাপের মতো পেঁচিয়ে আসছে তাকে লক্ষ্য করে এক নিঃসংগ খেজুর গাছ তার ক্ষত বেয়ে চুইয়ে চুইয়ে নামছে রস; বৃষ্টির মতো ঝমঝমিয়ে একটা ট্রেন অবিরাম ছুটে চলেছে ব্রিজের উপর দিয়ে। আর কিছু নেই। কোথাও কিছু নেই। শুধু চরাচর ডুবে আছে মগ্ন বিস্মরণে। 'বড় শীত হে, অনুপম' লোকটা তখন খালি নিজেকে বলে ফিসফিসিয়ে। □

সাধন ভাদুড়ী

শীতের নাইট ডিউটিতেও অনেক সুখ

চৌধুরীবাবু এইমাত্র ঘুম থেকে উঠলেন। এখন বিকেল সোয়া পাঁচটা। অবশ্য শীতের বেলা যেহেতু তাই একে বিকেল না বলে সন্ধে বলাই ভাল। শিয়রের কাছে স্ত্রী দাঁড়িয়ে। এক হাতে ধোঁয়া ওঠা চায়ের কাপ। অন্য হাতে এক গ্লাস জল।

চৌধুরীবাবু আড়মোড়া ভাঙলেন। হাত বাড়িয়ে জলের গ্লাসটা নিলেন। এক চুমুকে শেষ। টেনে নিলেন চায়ের কাপটা। তারিয়ে তারিয়ে চুমুক দিলেন। দিবানিদ্রার ফলে দুচোখের কোল বেশ ফোলা। মাথার চুল অবিন্যস্ত।

চা শেষ করে বিড়ির আয়েশি টান দিলেন কিছুক্ষণ। তারপর চৌকি থেকে নামলেন চৌধুরীবাবু। বাথরুমে ঢুকলেন। জলবিয়োগ সেরে চোখে মুখে জল দিলেন কয়েক ঝাপটা। আর কিছু সময় পরেই তিনি অফিসে বেরুবেন। নাইট ডিউটি। রান্নাঘরে তখন স্ত্রীর সন্ত্রস্ত ব্যস্ততা। উনোনের ওপর রুটি সেঁকা হচ্ছে। চৌধুরীবাবুর টিফিন। দুপুর-ভোজন সারতে তাঁর বেশ দেরি হয়। এসময় তাই তিনি কিছু খেয়ে বেরোন না। টিফিন নিয়ে যান।

হাত মুখ মুছে এবার পোশাক পরতে শুরু করলেন তিনি। পরনের ছোট লুঙ্গিটাকে প্রথমে গুটিয়ে মালকোচা মারলেন। তার ওপরে গলালেন প্যান্ট। গায়ে প্রথমে মোটা গেঞ্জি, তারপর ডাক ও তার বিভাগের কালচে সবুজ রঙের হাতকাটা খসখসে সোয়েটার।

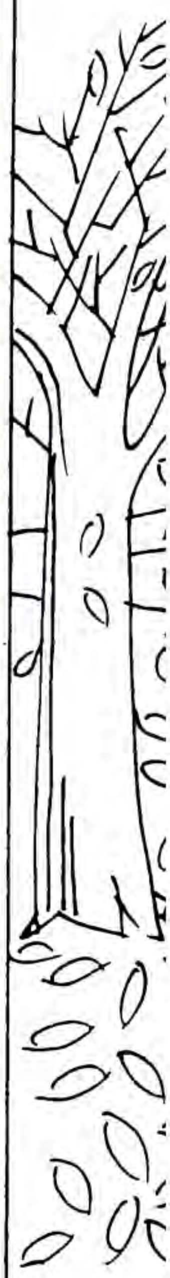
সোয়েটারটা আদিতে ফুল হাতাই ছিল, চৌধুরীবাবু নিজের উদ্যোগেই তার হাতা দুটি বাদ দিয়েছেন। সোয়েটারের ওপরে এবার খাকি ফুলহাতা জামা। তার ওপর ফুলহাতা আরও একটি খাকি সোয়েটার। সবশেষে অর্থাৎ আদত বহিরঙ্গে চাপালেন ঘনিষ্ঠজনের দেওয়া একটি মিলিটারি গরম জামা। এতেই

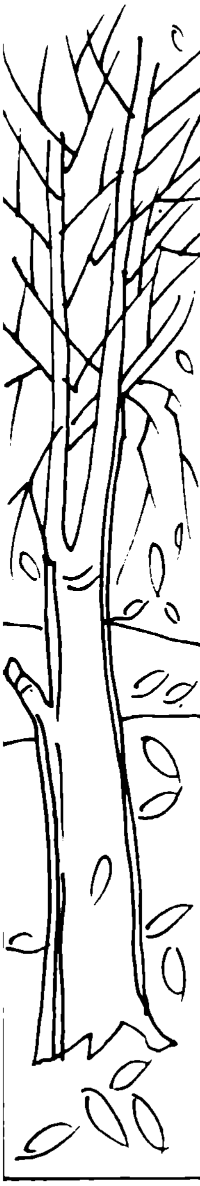


ফটো : শান্তি রায়চৌধুরী

শেষ নয়। লম্বা মাফলারটিকে এবার মাথায় জড়ালেন পাগড়ির মত করে। অনেকটা ছত্রপতি শিবাজির ধরনে। ততক্ষণে স্ত্রী টিফিন কৌটো গুছিয়ে দিয়েছেন। অভ্যস্ত হাতে সেটিকে কাঁধে ঝোলানো ব্যাগের গর্ভে চালান করলেন। সবশেষে হাতে নিলেন লাঠি। পাকা বেতের বেঁকানো দীর্ঘকায় চেহারা তার। লাঠি নেবার কারণ সম্পর্কে চৌধুরীবাবু সপ্রতিভ ভাবে যা জানিয়ে থাকেন তা হল, তাঁর এই কিম্ভূত পোশাকে হেঁটে যাওয়ার সময় রাস্তার কুকুরগুলো বড়ই উৎপাত করে। তাদের তাড়াবার জন্যই এই ব্যবস্থা।

অবশ্য সবাই চৌধুরীবাবু নন। কিন্তু শীতের রাতে নাইট ডিউটি করতে যাওয়ার ছবি প্রায় সকলেরই কমবেশি এরকম। সেই অর্থে একে 'যাওয়া' না বলে 'অভিযান' বলা বোধহয় ভাল। যখন বেশির ভাগ মানুষ সারাদিন কখনো আকাশের নিচে কখনো বা জানলা দিয়ে মিঠে রোদের আঁচ গায়ে মাথায় হৃদয়ে নিতে নিতে কাজ করে যায়, তখন এঁরা নাইট ডিউটির প্রস্তুতি হিসেবে দিবানিদ্রায় মগ্ন। সারাদিনের সোনালি রোদ্দুর এঁদের কাছে অধরা। স্ত্রীর হাতের ফুলকপির গরম ঝোল, মৌরালা মাছ সহযোগে ভাত খাওয়ার অনাবিল আনন্দ এঁদের থাকে না। শেষ বিকেলে যখন পাখিদের সংগে আফিসচারীদেরও ঘরে ফেরার তাড়া, তখন এঁদের সূর্যোত্থান ঘটে। একদলের চেতনায় যখন উষ্ণ ঘর, জমিয়ে চা, রসালাপি টিভি এবং নিশিভোজ অন্তে গমর বিছানার আহ্বান, অন্যদল তখন ব্যস্ত 'কর্তব্যের ডাকে' সাড়া দিতে। খুব সংগতভাবেই সাধারণের চোখে এঁরা অভাগা। গরম পোশাকে ঢাকা শরীর নিয়ে রাত ডিউটি করতে যাওয়া মানুষের ছবি দেখে আঁতকে ওঠে দিন ডিউটি সেরে ঘরে ফেরার দল। কারা আছেন এই দলে?





আছেন অনেকেই। রেলবাবু, টেলিফোন আর টেলিগ্রাফ অফিসের কেরানি-অফিসারের দল, হাসপাতাল-নার্সিং হোমের নার্স, আয়া, কারখানার শ্রমিক, খবরের কাগজের সংবাদ পরিবেশকারীরা পুলিশ ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই পর্যন্ত লেখার পর এবার একটা অকপট স্বীকারোক্তি করে ফেলা দরকার। এই প্রতিবেদকের শীতের রাতে নাইট ডিউটির অভিজ্ঞতা সেভাবে নেই। কখনো খাপছাড়া ভাবে দু একবার করে ফেলতে হয়েছে। তবে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা না থাকলেও চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা যথেষ্ট। প্রতিবেদনের শুরুতে যে চৌধুরীবাবুর কথা লেখা হয়েছে তিনি আমার পূজনীয় পিতৃদেব। আজ কমবেশি পঁচিশ বছর ধরে তিনি লাগাতার নাইট ডিউটি করছেন। রোজ, হ্যাঁ আক্ষরিক অর্থেই 'দৈনিক'। অন্যের রাত ডিউটি তিনি নিজের দিন ডিউটি দিয়ে বদল করে নেন। সত্যি বলতে কি, তাঁর এই অবাধ্য জ্যেষ্ঠপুত্রটিকে সারাদিন চোখে চোখে রেখে মানুষ করার জন্যই তিনি এই অভিনব পন্থাটি বেছে নিয়েছিলেন। এবং সেই অভ্যেসে আজও, আজকের দিন পর্যন্তও তিনি তা চালিয়ে যাচ্ছেন।

একটু অন্য প্রসঙ্গ হয়ে গেল। তবে একেবারে অপ্রাসঙ্গিক হল না বোধহয়। আসলে, সাধারণের ধারণা শীতের রাতে যাঁরা ডিউটি করতে বেরোন, তাঁরা খুব দুঃখী মানুষ, অনন্যোপায় হয়েই তাঁদের এই শীতার্ত রাতযাত্রা। কিন্তু যাঁরা এই যাত্রার আদত শরিক, তাঁরাও কি ব্যাপারটিকে ঐ একই চোখে দেখেন?

আমার ধারণা তাঁরা তা দেখেন না। একেবারে আলটপকা হঠাৎ নাইট ডিউটি করতে আসা মানুষজন ছাড়া, যাঁরা শীতের রাতে নাইট ডিউটিতে অভ্যস্ত তাঁরা এর সুখ বেশ তারিয়ে তারিয়েই উপভোগ করেন।

একে নাইট ডিউটি, তায় শীত! এমন শ্বেত-দুর্ভোগের ভেতরেও সুখ? নিশ্চয়ই আশ্চর্য হচ্ছেন। এই প্রতিবেদকের মাথার সুস্থতা নিয়েও আপানাদের সন্দেহ দেখা দিতে পারে। কিন্তু এখনই এ ব্যাপারে কোন মতামত না দিয়ে নিরপেক্ষভাবে দেখুন সত্যিই শীতে নাইট ডিউটির ভেতরে সুখ লুকিয়ে আছে কিনা।

ক এমনিতেই নাইট ডিউটি একটু কম কাজের চাপ থাকা ডিউটি। সবাই, সর্বত্র এটাকে মেনে নিয়েছেন। না মেনে উপায় কী? প্রকৃতি রাত সৃষ্টি করেছেন বিশ্রামের জন্য। খাটার জন্য তো নয়। তো, সেই রাতেই যদি খাটতে হয় তবে এই প্রকৃতি বিরুদ্ধ ব্যাপারে খাটুনির ঘাটতি পড়বেই। আর শীত হলে তো কথাই নেই। যিনি খাটবেন, আর যিনি খাটাবেন উভয়েই তো শীতের শিকার। প্রকৃত অর্থে খাটতে হচ্ছে দুজনকেই। কর্তার ইচ্ছেয় কর্ম। শীতে সেই কর্তার ইচ্ছেতেই কর্মে একটু ঢিলেঢালা।

খ. জোব্বা-চাদরের ঘেরাটোপে হাত-পা সহ শরীর সেভাবে নাড়ানো যায় না, ঢিলেঢালা কর্মের এমন একটা 'সলিড' অজুহাত সহজেই দেওয়া যায়।

গ. কে আর বিরাট অট্টালিকায় জীবন অতিবাহিত করেন মহাশয়া? যাঁরা করেন তাঁরা শীতে নাইট ডিউটি দিতে যান না। যাঁরা যান, তাঁদের বেশির ভাগই অট্টালিকায় থাকেন না। টালির চাল আর দেয়ালের ওপর অংশের সন্ধিস্থল দিয়ে হু হু ঠান্ডা হাওয়া ঢোকে বেশিরভাগেরই ঘরে। ঘরের আশ্রয় তাঁদের উষ্ণতা জোগায় না। ভাগের বিছানায় কাঁথা-কম্বল নিয়ে বউ ছেলেপুলের সঙ্গে টানাটানি। শীতের নাইট ডিউটি মানে মুক্তি। ঠান্ডা হাওয়া নেই। কাঁথা-কম্বলের ভাগীদার নেই।

ঘ. শীতে দিন ডিউটি সেরে সন্ধেতে বাড়ি ফেরা মানে হাতে কোনদিন কমলালেবুর ঠোঙা, কোনদিন নলেন গুড়ের বান্ডিল অথবা জয়নগরের মোয়ার প্যাকেট। রাত ডিউটি সেরে শীতের দিনে বাড়ি ফেরার সময় এসবের বালাই নেই। প্রত্যাশাও করে না কেউ। বাজারের থলের মুখ পেরিয়ে সস্তার ফুলকপি এবং ততোধিক সস্তা মূল্যের ডালপালা উঁকিঝুঁকি মারলেই হল। পরিজনের মুখে হাসিও থাকে, খরচও সংক্ষেপ হয়।

বিশ্বাস করুন, এভাবে সুবিধার তালিকা যদি সত্যিই পেশ করি তবে ক, খ, গ, করে ব্যঞ্জনবর্ণের সবকটি বর্ণকেই কভার করা যাবে। সে চেষ্টায় আপাতত যাচ্ছি না। আপনারা ভাবুন। দেখবেন এমন বহু সুবিধা আপনারাও আবিষ্কার করবেন যাতে শীতের নাইট ডিউটি আর কষ্টকর মনে হবে না।

এবার কিছু অন্য রোমান্টিক সুবিধার কথায় আসি। শীতে নাইট ডিউটিরত মানুষজনের সঙ্গেই ভূতের সাক্ষাৎ হয় বেশি। বাংলা সাহিত্যের বহু সার্থক ভূতের গল্প এই পরিবেশ এবং চরিত্র নিয়েই গড়ে উঠেছে। সেই নিষ্কম্প কেবিনম্যান, রেললাইনের দুপাশে ধূ ধূ মাঠের ভেতর একাকী লেভেল ক্রসিং সামলায় সে। হাতে তার টেমি লণ্ঠন। রেলগাড়ির ড্রাইভার দুরন্ত ছুটে চলার সময় যে আলোকবর্তিকাকে কুয়াশার ভেতরেও দুলতে দেখে। ভাবলেই কেমন এক গা ছমছম পরিবেশ।

এসবের পরেও যদি শীতে নাইট ডিউটির বিরুদ্ধে কখনো কোন আন্দোলন সংগঠিত হয়, তবে আমার ধারণা তাতে অনাস্থার ভেটো দেবে মাননীয় তস্কর সমাজ। সাদা কথায় চোরেরা। শীতে নাইট ডিউটি দেন তাঁরাও। অন্য সবার চেয়ে বেশি আন্তরিক এবং অসাধারণ কর্মতৎপরতায়। শীতের রাতে ডিউটি এঁদের কাছে সুফলদায়িনী আশীর্বাদ। □

শ্যামলেন্দু চৌধুরী

শীতের মর্নিং স্কুল : মায়েদের ব্যস্ততা

'ওঠ সেন্টু ওঠ, সাড়ে পাঁচটা বেজে গেল। উঠে পড় বলছি এক্ষুনি, তা না হলে আজ নির্ঘাত তোর ইস্কুল বাস মিস হয়ে যাবে।' বৌদির মৃদু চিৎকারে ধড়ফড় করে লেপ ছেড়ে উঠে বসল সেন্টু। একই সঙ্গে লেপমুড়ি দেওয়া শীতের সুখনিদ্রা ভঙ্গ হয়েছিল আমারও। তবে আমার তো আর স্কুল লেট হওয়ার ভয় নেই, বহুদিন আগেই এই জীবনটা পেছনে ফেলে অনেক দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে ফেলেছি। তাই ঘুম ভাঙলেও আলিস্যি কাটিয়ে সেন্টুর মত উঠে পড়তে পারছিলাম না। লেপের মধ্যে শুয়ে শুয়ে দেখছিলাম সেন্টুর ঘুম জড়ানো করুণ কচি মুখখানা।

'চল চল দাঁত ব্রাশ করেনে। গরম জল ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। যখন আমরা বড়রা লেপের নিচে শুয়ে বেড টি খাওয়ার আনন্দ উপভোগ করছি বেচারা সেন্টু তখন শীতে ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে স্নান করে, স্কুল ইউনিফর্ম পরছে। সাদা ফুল শার্ট, সাদা প্যান্ট, সবুজ টাই আর সবুজ সোয়েটার। সঙ্গে সাদা কেডস-মোজায় বেশ ঝকঝকে হয়ে উঠল সেন্টু। ইতিমধ্যেই টিফিন বক্স, ওয়াটার বটল সব রেডি করে বৌদি নিজেও শাড়ি পাল্টে একেবারে ফিটফাট।

ছেলেকে স্কুলে পৌঁছনো কিংবা নিয়ে আসা, এটা বৌদিরই রোজকার ডিউটি। ছটার মধ্যে রোজ ওদের বেরিয়ে পড়তে হয়। সোয়া ছটা থেকে সাড়ে ছটার

মধ্যে গাংগুলি বাগান মোড়ে স্কুল বাস আসে। স্কুল অবশ্য সাড়ে সাতটায়, কিন্তু বহু জায়গা থেকে বাচ্চা নিয়ে নিয়ে বাস স্কুলে পৌঁছতে দেরি করে, তাই যোধপুর পার্ক 'এ কে ঘোষ মেমোরিয়াল' স্কুলে যেতেই ঝাড়া দেড়টা ঘণ্টা হাতে নিয়ে বেরোতে হয় সেণ্টুকে।

এতো গেল রোজের কথা, সবদিন তো আর সমানভাবে ঘড়ির সংগে পাল্লা দিয়ে পেরে ওঠা যায় না, তাই স্কুল বাস মিস হওয়া মানেই বৌদির ভাগ্যে জোটে বিড়ম্বনা। যা পাওয়া যায়, যে কোন পাবলিক বাস ধরেই সেণ্টুকে নিয়ে স্কুলে ছুটতে হয় বৌদিকে। সেদিন কষ্টের শেষ থাকে না। আটটা সোয়া আটটার মধ্যে হাঁফাতে হাঁফাতে বাড়ি ফিরেই গ্যাস জ্বালে বৌদি। এক মিনিটও বিশ্রাম নেওয়ার জো নেই, নটার মধ্যে দাদাকে অফিসের ভাত দিতে হয়।

নিরুপায় বাবা মা আর ততোধিক অসহায় এই ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলো সারা শীতকাল কী দুঃসহ অবস্থার মধ্যে পড়ে, সেই জীবন্ত ছবিটা নিজের চোখে দেখে আসার সৌভাগ্য কিংবা দুর্ভাগ্য হয়েছিল একদিন।

'ঠাকুরঝি সেণ্টুকে একটু কষ্ট করে স্কুলে দিয়ে আসবে? দেখ না, আজ যা দেরি হয়ে গেল। সেণ্টুর বাস তো পাওয়াই যাবে না। এদিকে স্কুল পর্যন্ত যেতে হলে তোমার দাদার অফিসের ভাত আর দিতে পারব না।' অগত্যা সেণ্টুকে নিয়ে আমাকেই রওনা হতে হল।

ঠাণ্ডাটা বেশ জাঁকিয়েই পড়েছে। সেণ্টুকে দেখে মায়া হচ্ছিল। ফুল স্লিভ সোয়েটার আর মাফলারে কান মাথা ঢেকেও যেন সকাল ছটায় ওর শীত কমছিল না। আমিও শাল মুড়ি দিয়ে ওর ব্যাগ আর জলের বোতল নিয়ে বেরোলাম। রীতিমত কুয়াশা, রাস্তায় লোক চলাচল বেশ কম, শুধু আমাদের মত যাদের মর্নিং ডিউটি তারাই দৌড়চ্ছে ঠিক সময়ে পৌঁছনোর তাগিদে। এদের মধ্যে সেণ্টুর মত কিংবা ওর চেয়েও ছোট ছেলেমেয়েরা কেউ বা লাল, কেউ বা নীল 'ইউনিফর্ম'-এ শীতের ভোর কাটিয়ে চলেছে স্কুলের দিকে। আমাদের বাড়ি থেকে বাস স্টপ বেশ খানিকটা দূর। তাই খানিকটা হেঁটে বাকিটা রিক্সাতেই যেতে হয়।

গাংগুলিবাগান পৌঁছতে সাতটা বেজে গেল। ৪৫ নম্বর একটা বাস আসতেই তড়িঘড়ি সেণ্টুকে নিয়ে উঠে পড়লাম। আর দেখে অবাক হয়ে গেলাম বাস ভর্তি সেণ্টুর মত কিছু ছোট বা কিছু বড়



ফটো : অভিজিৎ রায়

ছেলেমেয়ে। সবাই চলেছে এই ঠাণ্ডায় মা বাবা কিংবা আমার মত আরো কারো হাত ধরে 'মর্নিং স্কুল' করতে। বাসে সেণ্টুর বন্ধুও আছে। ওরা রোজই পাবলিক বাসেই যাতায়াত করে। সেণ্টু হঠাৎ কোনদিন বাস মিস করলে দেখা হয়ে যায় এই শুভাশিস আর অভিরূপ এর সংগে। অতএব আর কি, তিন বন্ধুতে গল্পে মশগুল হয়ে উঠল। শুভাশিস আসে রামগড় থেকে, আর অভিরূপের বাড়ি আরও দূর, গড়িয়া লাস্ট স্টপ। ওদের মায়েদেরই রোজকার ডিউটি ছেলেকে স্কুলে দেওয়া-নেওয়া। আর সেই কারণে, বাসে দুই মায়ের আলোচনার বিষয়বস্তুও সেই একই, দৈনন্দিন ঝামেলা। একটু কান পাতলাম, নেহাতই কৌতূহলবশত।

শুভাশিসের মা, 'আর বলো না, আমার শুভকে ভোরবেলা ঘুম থেকে তোলা যে কী ঝকমারি তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না।' কথাটা বোধহয় শুভাশিসের কানে গেল, ও গল্প থামিয়ে মায়ের দিকে একটু করুণ মুখ করে তাকাল। অভিরূপের মা বলে উঠলেন, 'আহা, কি আর করা যাবে, বেচারা! ও বোধহয় একটু ঘুমকাতুরে। আমার তাতাই (অভিরূপ) আবার ঠিক উল্টো। আমার আর ওর বাবার ঘুম ভাঙার আগেই ও উঠে পড়ে। আর সকালে স্কুলে আসা নিয়ে কোনদিনই ও আমায় জ্বালায়নি। হলে কী হবে, ওর বাবা তো উঠতেই চান না, লেপমুড়ি দিয়ে ওনার সকাল যেন আর হতেই চায় না। তাই তাতাইকে স্কুলে দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে বাজারটাও আমাকেই করে নিতে হয়।'

শুভর মা – 'তুমি যাই বল অনিতাদি। তোমাকে তো আর অফিসের ভাত দিতে হয় না।'

অনিতাদি – 'হ্যাঁ ওরকম মনে হয়, তোমাদের তো একটা নির্দিষ্ট রুটিন আছে, তাই কাজও আছে। বিশ্রাম আর অবকাশ আছে। আমার ভদ্রলোকটি তো যখন তখন বেরোন, ঢোকেন। ফলে আমার শান্তির শেষ নেই জানো তো'

এসব কথার মধ্যে আমাদের পরিবারের ছবিটা নিয়েও যে কখন মশগুল হয়ে পড়েছিলাম খেয়ালই নেই। 'যোধপুর পার্ক – আস্তে বাচ্চা আছে, লেডিজ' কণ্ডাক্টরের চিৎকার শুনে সম্বিত ফিরে এল। ধড়ফড় করে সেণ্টুর হাত ধরে বাস থেকে নেমে পড়লাম।

স্কুলের গেটে বাচ্চাদের সংগে মায়েদের ভিড়। রঙ বেরঙের শাল গায়ে মায়েদের একই আলোচনা কার কী সমস্যা। সবাই বোঝাতে ব্যস্ত। কে কত দূর থেকে আসছেন, কেমন সুন্দরভাবে সব সামলাচ্ছেন ইত্যাদি। মাঝখান থেকে আমি শুধু লক্ষ্য করছিলাম বাচ্চাদের মুখগুলো। কেউ বাবার গাড়ি থেকে নামছে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল হাসিখুশি মুখ। আবার কেউ বা দূর থেকে পাবলিক বাসে হাঁফাতে হাঁফাতে এসে পৌঁছচ্ছে। মা-ছেলে দুজনেরই ঈষৎ শুকনো কিছুটা ক্লান্ত মুখ।

ঋতুর বিবর্তনে গ্রীষ্ম, বর্ষার মতই শীতও তো আসবেই। তাই কষ্ট বোধহয় মধ্যবিত্ত বাচ্চাদেরই সবচেয়ে বেশি। গরমে তেতে পুড়ে, ঝমঝমে বৃষ্টিতে ওয়াটার প্রুফ পরে আধভেজা হয়ে এরা স্কুলে আসে। আবার বড় স্কুলে পড়তে না পারলে নাকি ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

আর তাই ভবিষ্যৎকে আলোকোজ্জ্বল করে তুলতে বেচারি ছোট ছেলেমেয়েগুলো লেপমুড়ি দিয়ে শীতের ঘুম কিংবা, স্নান করে শীতের রোদ পোহানোর সুখ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। □



পাঞ্চালী মিত্র



রৌদ্রস্নানে শীতের দুপুর

একটা নাসপাতি রঙের পশমের গোলা নরম উষ্ণ কোলে আস্তে আস্তে ছোট হয়ে আসে। একটা শীতের দুপুরও শেষ হয়ে যায়। এই দুপুর যেন এক একটা পরিপূর্ণ জীবন। ছাদের আলসে, বারান্দার কোণে কিংবা দুঃখের গৃহস্থালীর ঘরকন্নার উঠোনে হঠাৎ স্বচ্ছল রোদে ভিজে চুল শুকতে শুকতে শীতের দুপুরে সোয়েটার, মাফলার বুনতে বুনতে শ্যামলী, শেফালি কিংবা একালের প্রজ্ঞাপারমিতা, উশ্রী, নন্দিনীরা রৌদ্রস্নান করেন। এদেশের নরনারীরা কখনই রৌদ্রস্নান করেন না একমাত্র শীতের দুপুর ছাড়া। কারণ কি দেশটা গ্রীষ্মপ্রধান বলে শরীরের কোষে জমে থাকা ক্লান্তি, বিষাদ কিংবা নির্বাপিত তৃষ্ণার ছাই ধুয়ে ফেলতে শীত দুপুরে রৌদ্রস্নান দরকার। শুধু কি দেহের



শীত! মনের কুয়াশায় ঢেকে থাকা চাওয়া পাওয়ার গ্লানিও তো কম নয়। কুড়ি পেরতেই বুড়ি হওয়া বাঙালিনী কিংবা বদহজম, বদমেজাজে ভোগা বাঙালিবাবু সমাজ তো কখনই প্রকৃতির কাছে উন্মুক্ত অবারিত হয় না। শীতকালে ফাটা ফাটা, গমরকালে ঘামাচি, বর্ষাকালে হাঁচো হেঁচি কোনকালে ছিলে তুমি রূপসী, এই রকম একটা আক্ষেপ বাংলার সনাতনী কণ্ঠে শোনা যেত। অস্বাস্থ্য, অসুস্থ, অভাব এই নিয়ে ঘর সংসার করতে করতে হঠাৎ কয়েকটা মাস ফাটা ফোটা সত্ত্বে রমণীয় হয়ে ওঠে। রোদকে তখন মনে হয় স্বাদু ফলের কাটা টুকরোর মত, দিন ছোট হলেও রাতকে মনে হতে পারে দূরপাল্লার রেলগাড়ি। ভোরে স্টেশনে পৌঁছে খুলে দেবে রোদের রাঙতা মোড়ক। সোনালি দিন। দিনের অর্ধেকটাই তো গা গতর নরম করা দুপুরের আকাঙ্ক্ষায় ভরা।

শীতের দুপুরের স্মৃতি বাসতেল আর হারিয়ে যাওয়া হিমানী ক্রীমের গন্ধে ভরা। এই দুইটির মিশ্র গন্ধের অ্যালবামে যেন অনেক কিশোরী, যুবতী এমন কি অনেক স্নেহময়ী প্রৌঢ়াও অম্লান হয়ে আছেন। এক একটা গন্ধের অনুষঙ্গে একজন একজন বেঁচে থাকেন। লেপ, তোশক, বালিশ রোদ দেওয়া হলেও মনে হয় শীতের দুপুর এসে গেছে। ধুনুরির টংকারে মনে হয় শীতটা যেন টান টান হয়ে আসছে, প্রতিরোধের জন্য তৈরির ঘোষণা মাত্র। ছাদের আলসে থেকে শ্যামলীর সংগে ওপাশের বাড়ির মাধুরী বউদির কথা হয় – 'ওর একটাও গরম জামা নেই, সেই সকালে বের হয়'। পোশাকে উষ্ণতাই নয়, স্ত্রীর শরীরের উষ্ণতাও কম নয়। 'দেখি দেখি ডিজাইনটা বাঃ কালারটাও দারুণ।' পার্কে ক্রিকেট খেলা হচ্ছে। শীতের দুপুরের রাজপুত্তুর সব। সাদা পোশাকে মাঠ আলো করা শীতের যৌবন। খেলার রাজা ক্রিকেট, পোশাকে আশাকে খানাপিনাতেও বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনে শীতের দুপুর



কিছু রাজসিক বলে মনে হয়। পাড়ার ভোঁদা, পানতু, পল্টুদা, খেদুদারা পার্কের ঘাসে সবুজ গালিচায় সব দৈন্য, ব্যর্থতা আর বেকারত্ব ভুলে রূপকথার নায়ক হয়ে যায়। একটা মাত্র চিৎকারে ঠিক দুপুরে কত কিশোরী-যুবতী হৃদয় বিদ্ধ হয়ে যায় 'হাউস দ্যাট'। কে যেন আউট হয়ে গেল। জানলায়, বারান্দায় ছাদের কার্নিশে কয়েক জোড়া কৌতূহলী চোখ উৎসুক হয়ে ওঠে – ভোঁদা তখন ক্রিকেট পিচের উপর দিয়ে ভীমের গদা কাঁধে ভঙ্গিতে ব্যাট হাতে নির্বিকারে হেঁটে চলে যায়। যত হেলাফেলাই হোক এঁদো গলিতে শীতের দুপুর যেন রাজমুকুট পরিয়ে দেয় রৌদ্রস্নাত যৌবনকে। যে ভোঁদা বা খেদুদারা কখনই চোখে পড়ে না, উপেক্ষা আর অবহেলার স্বীকার হয়, তারাই শীতের দুপুরে ইউনিভার্সিটির নন্দিনী, প্রজ্ঞাপারমিতার ঔৎসুক্য কেড়ে নেয়। তাই মনে হয় যেকোনো ঋতুর দুপুরের থেকে শীতের দুপুর একটু ভিন্ন স্বাদের।

অস্বচ্ছল সংসারের উঠোনে শীতের দুপুরের স্বচ্ছল রোদে ভাঙা মোড়াতে বসে গৃহকর্ত্রী নাতি-নাতনির উৎপাত সহ্য করেন। চাদরটাকে মাথায় পাগড়ি করে পরে দাদু যখন খবরের কাগজ দেখেন তখন মনে হয় এরা কত সুখী সম্পন্ন। লেপ তোশকের ভেতর চুঁইয়ে পড়া রোদের উত্তাপেও গভীর রাতের আরামকে রৌদ্রোজ্জ্বল করে রাখে। দম্পতির দেহসান্নিধ্যে, নিঃসঙ্গ যৌবনের কাতরতায় কিংবা জীর্ণ বার্ধক্যের নিদারুণ শীতল বিছানায় শীতের দুপুরের উষ্ণতা থেকে যায়। অফিস, ইস্কুল, কলেজ পালানো প্রেমিক-প্রেমিকা তো এই শীতের দুপুরগুলো লুটে পুটে ভোগ করে। গঙ্গার ঘাট, ইডেন হর্টিকালচার আর কোম্পানির বাগান অর্থাৎ বোটানিক্যালে রঙে-বেরঙে পশম পোশাকে প্রজাপতির মতো লুটোপুটি করে। কমলালেবুর কোয়ার মত ঠোঁট ফেটে চৌচির, বোটানিকস-এর কোন নিবিড় সবুজ আঁধারে শীতের দুপুরের একটি চুমু দিয়ে যায় ভবানীপুরের বিকাশ যাদবপুরের মিতালিকে।

আমাদের এই সমতলে শীত আসে, আসে চিড়িয়াখানার ঝিলে সাইবেরিয়ার পাখি, কত আগন্তুকই তো আসে ফুলের মতো শিশুদের নিয়ে সপরিবারে আসে অনেকে চিড়িয়াখানায়।



ওয়েলিংটনের রেলিং-এ ভুটিয়া মহিলারা টাটকা ফলের মত চেহারায় পশমের পোশাক বিক্রি করে। শীতের দুপুরে হারাধনবাবুরা সপরিবারে আসেন গরম জামা, চাদর কিনতে। ভুটিয়া নারীর দেহের কান্তি দেখে চোখ পাকিয়ে গিন্নিকে বলেন, 'মাগীগুলোর চেহারা কেমন দেখেছ। যৌবন যেন উপচে পড়ছে। খায় কি ?'

ভুটিয়া রমণীর যৌবনে হারাধনবাবুরা দুপুর রোদে উষ্ণ হয়ে নেন। অম্বল আর অজীর্ণ রোগে হারধন গৃহিণীরা জেরবার হলেও কপি পালঙে-র ঢেকুর তুলে বলেন, – 'শরীর কী সাধে ভাল থাকে খায়-দায় ভাল। মনে কত স্ফূর্তি মন্দগুলো কি কম পুষ্ঠ।' দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলে কমলালেবু, কেক আর নতুন পশমের জামা চাদর কিনে বাড়ি ফেরে হারাধন পরিবার।

দুপুর রোদে ক্রিকেট, উলবোনা, রোদ পোহানো, কাগজ পড়া সব নিয়ে মনোরম শীত বার বার ফিরে আসে। দিন বদলেও বাঙালি জীবনে স্মৃতির আলবামে শীতের দুপুর রৌদ্রস্নানে সিক্ত উষ্ণ। □

সুব্রত রাহা

শীতের প্রেম

আমার এক পঞ্চাশোর্ধ সহকর্মীর সংগে এক ভদ্রমহিলার মাখো মাখো সম্পর্ক ছিল। প্রায়ই ভদ্রমহিলা আমাদের অফিসে চলে আসতেন। ভিজিটার্স রুমে বসে হ্যা হ্যা করতেন। আমার পক্ককেশ সহকর্মীটি পুলকিত হতেন, অল্পবিস্তর রোমাঞ্চিতও। তাঁর সেই রোমাঞ্চ বা পুলক যাই বলুন না কেন মাঝে মাঝে আমাদের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াত। বেশ কিছুদিন তাঁদের প্রেমপর্ব প্রত্যক্ষ করার পর একদিন আমি সহকর্মীটিকে জিজ্ঞেস



ছবি : অভিজিৎ রায়

করেছিলাম, 'আচ্ছা দাদা, বত্রিশটা দাঁতের বেশিরভাগই তো খুইয়েছেন, তা এই বয়সে প্রেম-টেম কি মানায় সহকর্মী ভদ্রলোক মুখ খিঁচিয়ে জবাব দিয়েছিলেন, 'কেন, প্রেম কি আমি দাঁত দিয়ে করব এর পরে আর কোনো কথা থাকতে পারে না, কাজেই আমি আর সহকর্মীটিকে ঘাঁটাবার সাহস পাইনি। চুপ করে গিয়েছিলাম।

আজ এতদিন পরে ঘটনাটি মনে পড়ল 'সুকন্যা'র দপ্তর থেকে 'শীতের প্রেম' লেখার আর্জি শুনে। দাঁতের সংগে যেমন প্রেমের সম্পর্ক নেই, শীতের সংগেও বোধহয় তার কোনো ক্ষীণতম যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যাবে না। এ কথাটি অবশ্য জানাইনি সম্পাদকীয় দপ্তরকে। কারণ, জনান্তিকে জানিয়ে রাখি, শীতকাল এলেই আমার মনটা কেমন উড়ু উড়ু হয়ে যায়। এ পোড়া কপালে কোনো ষোড়শী বা অষ্টাদশী কিংবা বেয়াল্লিশকে যিনি চব্বিশ বলে চালানোর চেষ্টা করছেন তেমন কোনো ভদ্রমহিলাও জোটেনি। তবু শীতকাল এলেই একটা প্রেম প্রেম গন্ধ মনটাকে ফুরফুরে করে তোলে

কালিদাস থেকে হাল আমলের কবিরা পর্যন্ত বর্ষাকালকেই তাঁদের প্রিয় ঋতুর তালিকায় ঠাঁই দিয়েছেন। এখনও পর্যন্ত শীতকালকে কেউ তাঁদের প্রিয় ঋতুর মর্যাদা দেননি। কয়েকজন কবি সাহিত্যিক শীতকালকে একটু করুণা করেছেন, তাও তাঁদের ভোজন-বিলাসিতার জন্যই। কারণ শীতকাল মানেই তো ভালো খাওয়া-দাওয়া কপি, পালংশাক, পিঠে-পুলি, পায়েস, নলেন গুড়ের সন্দেশ। কিন্তু শরীরী প্রেম কিংবা দেহাতীত প্রেম তার সম্পর্ক কোথায় শীতের সংগে। কেউ তা খুঁজে পেলেও পেতে পারেন, আমি পাইনি। সুনীল গংগোপাধ্যায় তাঁর কোনো এক গল্পে যেন লিখেছিলেন, 'অনেক গল্প-উপন্যাসে দেখা যায়, মধুপুর বা শিমুলতলার মতন জায়গায় বেড়াতে গেলে উঠতি বয়েসের ছেলেমেয়েদের মধ্যে একটা প্রেমের ব্যাপার হয়ে যায়... '। এরকম ব্যাপার স্যাপারের কথা যদি বলেন তাহলে বলব, হ্যাঁ এর জন্য শীতকালই উপযুক্ত সময়।

শীতকাল ভ্রমণের ঋতু। কাজেই অশোক যদি বাড়ির লোকজনদের কাছে আনন্দ আর মৃন্ময়ের সংগে দীঘা বেড়াতে যাচ্ছে বলে নন্দিতাকে নিয়ে বকখালি চলে যায়, কারই বা কী বলার থাকতে পারে !

শীতকাল এলেই বাবুঘাট, ইডেন, ভিক্টোরিয়া, চিড়িয়াখানায় ফুলের মতো যুবক-যুবতীদের ভিড় জমে। বাসে যেতে যেতে দেখি ভিক্টোরিয়ায় গাছের নিচে রাধাকৃষ্ণের মূর্তি। ইডেনেও একই দৃশ্য। রোমিও-জুলিয়েটদের হাসি-ঠাট্টায়, গর্বিত পদচারণায়, কত জন্মের জমে থাকা কথা কয়েক ঘন্টার অবসরে বলে ফেলার আপ্রাণ বাসনায় শীতও পালাই পালাই করে। জানি না, এসব শীতকালীন প্রেম না প্রেমকালীন শীত নিবারণের চেষ্টা।

শীতকালীন প্রেমের ওই গল্পটি নিশ্চয়ই আপনাদের জানা। প্রেমিক দেরি করে ফেলেছে আসতে। পার্কে প্রেমিকা অধীর প্রতীক্ষায়। হন্তদন্ত হয়ে এসে প্রেমিক দেখে, তাদের প্রতিদিনের বসার জায়গাটিতে আপাদমস্তক চাদরে ঢেকে বসে রয়েছে প্রেমিকা। হয়তো বা অভিমানই হয়েছে। প্রেমিক অপরাধীর মতো প্রেমিকার পিছনে দাঁড়িয়ে সাফাই গাইতে থাকে, 'রাগ করো না তপতী, কাল থেকে আর এরকম দেরি হবে না। হতচ্ছাড়া বাড়িটার জন্য যে আগে বেরোব তার উপায় নেই। একটা না একটা কাজের দায়িত্ব ঘাড়ে চাপিয়ে দেবে।' প্রেমিকার মুখে কোনো রা নেই। সাহসী প্রেমিক এবার আলতো করে টান দেয় প্রেমিকার চাদরে। 'কে র‍্যা' বলে এবারে যিনি চাদরের ভিতর থেকে মুখ বাড়ান, তিনি আর কেউ নন, প্রেমিকের বাবা। সান্ধ্য ভ্রমণে এসেছিলেন তিনি। এরকম অভিজ্ঞতার



মুখোমুখি হলে আমি নিশ্চিত, শীতের প্রেমে পাঠক-পাঠিকার কোনো আগ্রহই থাকবে না।

আর একটি গল্প মনে পড়ছে। ইডেন গার্ডেনে এক শীতের সন্ধ্যায় ঘনিষ্ঠ হয়ে বসেছিল দুই প্রেমিক-প্রেমিকা। নিচুস্বরে কথাবার্তা বলছিল। একটু দূরেই বসেছিলেন এক দম্পতি। প্রেমিক-প্রেমিকা লক্ষ্যই করেনি দম্পতিটিকে। কাজেই তাদের নিচু স্বরের কথাবার্তা এক সময় উঁচু গলাতেই শুরু হল। বিবাহিত মহিলাটি প্রেমিক-প্রেমিকার কথা শুনতে শুনতে স্বামীকে বললেন, 'দ্যাখো, ওরা যেভাবে প্রেমের কথা বলছে, এখনই না বিয়ের প্রস্তাব করে বসে। তুমি একটু গলা খাঁকারি দিয়ে ওদের সাবধান করে দাও না যে, আমরা পাশেই আছি।' ভদ্রলোক মুখিয়ে উঠলেন, 'ভারী বয়ে গেছে আমার। আমার বেলায় কে সাবধান করেছিল শুনি!'

আর একটি গল্প। শীতকাল। স্বামী-স্ত্রী সার্কাস দেখতে গিয়েছিলেন। একটি মেয়ে সিংহের খেলা দেখাচ্ছিল। মেয়েটি যা বলছিল, সিংহটি তাই করছিল। খেলা দেখতে দেখতে স্ত্রী স্বামীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি ওরকম পারো?' স্বামীর সাড়ে ছাব্বিশ ইঞ্চি ছাতি মুহূর্তেই ফুলে ছত্রিশ। বললেন, 'নিশ্চয়ই পারি।' স্ত্রী তেড়ে উঠলেন, 'চলো তো, দেখি তোমার কত মুরোদ।' মিনমিনে গলায় তখন স্বামী বললেন, 'আহা, আমি খেলা দেখাবার কথা বলছি নাকি বলছি, সিংহের চেয়ে বেশি পোষ মানতে পারি ওই সুন্দরীটির কাছে।'

এই পর্যন্ত পড়ে পাঠক পাঠিকা, যাঁরা শীতের প্রেমে মজে যান বা মজা পান নিশ্চয়ই আমার ওপর বিরক্ত হচ্ছেন। কিন্তু গল্পগুলো আমার বানানো নয়, একেবারে সত্যি। আপনারা এর বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলবেন। আমি বলব, প্রেমের গল্প আর গল্পের প্রেমের মধ্যে অত সত্যি মিথ্যে খুঁজতে গেলে চলে তবে এসব গল্প শুনিয়ে আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে চাই না। আর মাত্র দুটো গল্প শুনিয়েই শেষ করব শীতের প্রেম।

এক চিত্র প্রদর্শনীতে গেছেন স্বামী-স্ত্রী। একটি ছবির সামনে দাঁড়িয়ে পড়েছেন স্বামী। তাঁর পা আর নড়ছে না, চোখ সরছে না ছবি থেকে। ছবির বিষয় : এক ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত নারীদেহ। নিম্নাঙ্গ লতাপাতায় ঢাকা। ছবির নিচে ক্যাপশন : বসন্তকাল। স্বামীর চিত্রার্পিত অবস্থা দেখে স্ত্রী ঝাঁঝালো গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'কী গো, পাতাঝরার জন্য কি তুমি শীতকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করবে শেষ গল্পটি বলি। শীতকাল। প্রেমিকা চিঠি লিখছে প্রেমিককে। প্রিয়তম, তোমাকে দেখার জন্য আমি অধীর হয়ে উঠেছি। তোমার এক-একটি চিঠি যেন জীবনানন্দের কবিতা। তোমার হাসি আপেলের মত। তোমার জন্য আমি কী না করতে পারি তোমার জন্য আমি সাইবেরিয়ার মরুভূমিতে বিনিদ্র রাত কাটাতে পারি। ঝাঁপ দিতে পারি উত্তুঙ্গ পাহাড়ের চূড়ো থেকে। তোমার একটিমাত্র ইঙ্গিতেই ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি উত্তাল সমুদ্রে। বুকের রক্ত দিয়ে লিখতে পারি একশো আটটি প্রেমপত্র। তুমি আজ রাত্রি আটটার সময় হলুদ রঙের বাড়িটার দক্ষিণ দিকের বড় শিমুল গাছটার নিচে দাঁড়াতে বলেছ। ইচ্ছে করছে খুব। কিন্তু কী করে যাই বলো তো একেই আমার টনসিলের রোগ, তারপর মাঘ মাসের হাড় কনকনে শীত। কিছুতেই পারব না তুমি কিছু মনে করো না লক্ষ্মীটি

মৃণালকান্তি দাশ



শীতের পড়াশোনা

পুজোটা এবার ভালই কাটল – বুঝলেন কিনা, একদম টেনশন-ফ্রি। অন্যবছর পুজোর ছুটি মানে পরীক্ষার আতঙ্ক, স্কুল খুলেই অ্যানুয়েল পরীক্ষা। পুজোর দিনগুলোতেও টেনশন থাকত। ছেলেমেয়েদের আর কী দোষ দেব বলুন! চারদিকে উৎসব, হৈ-হুল্লোড় মাতামাতি। চারদিনের জায়গায় হপ্তাভর ধুমধাড়াক্কা চালিয়ে মা দুর্গা অসুরের চুলের ঝুঁটি ধরে চলে গেলেন, মা লক্ষ্মী এসে মুচকি হেসে মা কালীকে আসরে নামিয়ে কেটে পড়লেন।

ছেলেমেয়েরা দোদমা ফাটায়, জব্দ-জব্দ হয়ে বাবা-মায়েরা হেঁদিয়ে পড়ে থাকে, ওদের বুক ধড়ফড় করে। দু'দিন বাদেই অ্যানুয়াল পরীক্ষা। ওরে তোরা যে দাঁড়িয়ে ফেল করবি। ওরে পড়তে বোস। কে কার কথা শোনে!

ভাইফোটা রয়েছে না! সেও তো ইদানীংকালে মহোৎসব। ছেলেমেয়ের বাবা যাবে তার বোনের বাড়ি, জগদ্ধাত্রী সেজে মা যাবে বাপের বাড়ি ভাইকে ফোঁটা দিতে। ছেলেমেয়েদের পোয়াবারো। তবুও পরীক্ষার মুখোমুখি নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ করে কয়েকদিন পড়াশোনা। শীত পড়তে না পড়তেই, নভেম্বরে পরীক্ষা শেষ। শীতের সঙ্গে পড়াশোনার সম্পর্ক নেই। গত বছর পর্যন্ত এরকমই ছিল। ছেলেমেয়েদের কাছে শীত মানে খাওয়া, বেড়ানো, টি ভি সিরিয়াল, পিকনিক। কিন্তু এবার থেকে সেটি আর হচ্ছে না, এবছর থেকে শীত মানেই পড়াশোনার মরশুম। প্রতি ঘরে ঘরে।

ভদ্রমহিলা এতক্ষণে যেন দম নিলেন। বললাম, আপনি নতুন শিক্ষাবর্ষ চালু হওয়ার কথা বলছেন নিশ্চয়ই। এটা তাহলে ভালই হয়েছে বলছেন।

– একশবার। শীতের পড়াশোনার



ফটো : অর্পিতা রায়

ব্যাপারটাও একনোই চালু হবে।
তা ঠিক। মার্চ মাসে মাধ্যমিক পরীক্ষা। এর পাশাপাশি চলবে ক্লাশে ওঠার পরীক্ষা। ফলে শীতকালেই তো ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা। নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু হচ্ছে ১ মে থেকে ৩০ এপ্রিল।

এ পর্যন্ত মানা গেল অর্থাৎ নতুন শিক্ষাবর্ষের কল্যাণে স্কুলের ছেলেমেয়েদের পরীক্ষার পড়া মুখস্থ করতে হবে। কিন্তু পড়াশোনা মানে তো শুধু পরীক্ষা পাশের পড়া নয়। সাহিত্যের পড়াশোনার ব্যাপারটাও রয়েছে। এবং এই প্রসংগটি কলমের ডগায় রেখে আপনাকে একজন সাহিত্যের পড়ুয়া ধরে যদি জিজ্ঞেস করি, আপনি শীতে কী পড়েন – আপনি হয়ত বিরক্ত হয়ে জবাব দেবেন, ধুৎ মশাই শীতে গরম জামাকাপড় পরি।

সত্যিই তো, যারা পড়ুয়া, তাদের কাছে শীত গ্রীষ্ম বলে কিছু থাকে নাকি! শীতের জন্য বিশেষ ধরনের পড়াশোনা তো থাকবার কথা নয়। এমন পাঠকের সন্ধান আছে নাকি, যিনি গ্রীষ্মে গল্প পড়েন, বর্ষায় শুধু কবিতা পড়েন, শীতে প্রবন্ধ সাহিত্য পড়েন এবং এইরকম আরও অন্যান্য হেমন্তে বা শরতে! আমার অন্তত জানা নেই।

তবে 'শীতের পড়াশোনা' কথাটা উঠল কেন? আপনি হয়তো বলবেন, শীতকালে খেয়ে আরাম, বেড়িয়ে আরাম, জামাকাপড় পরে আরাম, লেপে কম্বলে ঘুমিয়ে আরাম, ট্যাঁক গরম থাকলে বাজার করে আরাম, কেজো লোকদের কাজে আরাম। তাই যদি হয় তবে পড়ুয়া হিসেবে বুক ঠুকে বলুন তো শীতকালে আপনার পড়াশোনাটাও জমে ওঠে কিনা!

বার্নার্ড শ বলেছিলেন, এনি টাইম ইজ রিডিং টাইম। লেখার ক্ষেত্রে ঋতুর প্রভাব থাকলেও বহু শিল্পী সাহিত্যিকদের পড়াশোনার বেলায় ঋতু নাক গলাতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের কাছে বাংলার ষড়ঋতুই বিশেষ রূপে বার বার ধরা দিয়েছে। তিনি আবিষ্ট ঋতুরংগে। কিন্তু পড়াশোনার ব্যাপারে কবির কাছে শীতকালটার বিশেষ প্রভাব ছিল বলেই তিনি লিখেছেন এমন সাজাদপুরের দুপুর বেলা – আমার গল্পের দুপুর বেলা, চতুর্দিকের সংগে সম্পূর্ণ মিশে গিয়ে লেখা এবং পড়া। আসল কথা হল মেজাজ। শীতকালের এমন একটা আমেজ আছে যা আপনাকে তুলনামূলকভাবে একটু বেশি উৎফুল্ল করে। আপনার মন মেজাজ শরীর স্বাস্থ্য তরতাজা থাকে। ক্লান্তি কম, উদ্দীপনা বেশি। আপনার ঝোলা থেকে বই বের করে যত্র-তত্র বসে পড়তে পারেন। এর ওপর বাড়তি টনিক রয়েছে বইমেলা। সেও তো শীতেই। পড়ুয়ারা দলে দলে যাচ্ছে, সাধ্যমত বই কিনছে, ছাদে বা বারান্দায় গলানো সোনার মত এক হাঁটু রোদ্দুরে বসে অথবা জম্পেস ঠান্ডার রাতে, পাশে গরম কফি, লেপের ভেতর থেকে মুখ বের করে দুহাতে ধরা মনের মত বই, টাটকা বইয়ের পাতা ওড়ানো হাওয়া থেকে ভেসে আসে আউল বাউল গন্ধ – সে তো শীতেই।

কে কী পড়েন, তা নয়, কোন ঋতুতে কে কত বেশি বই পড়েন তেমন কোনও সমীক্ষা কেউ করেছেন বলে জানা নেই। শিল্পী সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী ছাত্র এবং বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত সাধারণ পড়ুয়াদের নিয়ে সাক্ষাৎকারভিত্তিক এমন একটা সমীক্ষা করলে বেশ হয়। এবং এটা যদি করা হয়, আমার স্থির বিশ্বাস, বেশি ভোট পড়বে শীতকালের পক্ষেই। আপনি কী বলেন □

জীবন ভৌমিক

শীতের ফুল

ঝকঝকে আয়নার মতো আকাশ, গলানো সোনার হলুদ রঙ চনমনে রোদ, বর্ণালী মরশুমি ফুলের বাহার এই নিয়ে শীত। পশ্চিম বাংলায় শীতের প্রধান ফুল গাঁদা। ভ্যান গঘের প্রিয় রঙ গায়ে মেখে অজস্র গাঁদা শীতকে চোখের প্রিয় করে তোলে। কমলা রঙের গাঁদা আলাদা এক ছন্দ আনে। এছাড়া বিভিন্ন মরশুমি ফুল। শীতকালীন ফুল বলতে মরশুমি ফুলকেই বোঝায়। বিভিন্ন রঙ ও জাতের মরশুমি ফুল আছে। যেমন ডায়ানথাস।



ডায়ানথাসের গাছ আকারে ছোট – আট দশ ইঞ্চি। ঈষৎ লতানো। বেগুনি রঙ বাদে সব রকম রঙের ডায়ানথাস চোখে পড়ে। আবার একই ফুলে বহু রঙের বর্ণালী। এক ফুল ছাড়া থোকা ডায়ানথাসও আছে। বর্ণের প্রচুর বাহার থাকলেও এর কোনো গন্ধ নেই।

কার্নেশন। কার্নেশন দেখতে অনেকটা ডায়ানথাসের মতোই। কার্নেশন গাছের পাতা মোটা। পাতার রঙে কুয়াশার হাতছানি। থোক ফুল হয় বিভিন্ন রঙের। ডায়ানথাসের মতো বর্ণময় হলেও এই ফুলের বর্ণে প্রভা কম। উজ্জ্বলতার ঘাটতি থাকলেও এই ফুলে হালকা লবংগের গন্ধ আছে।

কসমস। ঝিরঝিরে ধরনের পাতা। তিন চার ফুট লম্বা গাছ। একক ফুল হয়। এই ফুলও গন্ধহীন। হলুদ রঙ ছাড়া আর সব রঙেরই ফুল হয়। যখন মৃদু হাওয়ায় গাছ সুদ্ধ দোলে তখন দেখতে খুব ভাল লাগে।

ফ্লক্স। পাঁচ ছ ইঞ্চি উচ্চতার ছোট গাছ। একক ফুল হয়। ফ্লক্সও হলুদ ছাড়া সব রঙের হতে পারে। গাছের প্রচুর ডালপালা। ফলে একেকটা গাছ দেখতে ঠাসা লাগে। যখন ফুল ধরে তখন অগুনতি ফুল ভরা গাছ চোখকে টানে।

সালভিয়া। ঝুনো সবুজ পাতার মতো



পাতা। গাছের উচ্চতা আড়াই-তিন ফুট। ফুলগুলোর রঙ লকলকে আগুনের শিখার মতো। কোনো রকম গন্ধ নেই। মিশ্র ধরনের সালভিয়াও আছে। ফুলের নানা রঙ – সাদা, বেগুনি, গোলাপি, হলদে।

পপি। আফিং জাতের গাছ। গার্ডেন ভ্যারাইটির পাপিতে আফিং-এর পরিমাণ খুব কম। দেড় ফুট উচ্চতার হালকা গাছ। একক ফুলই বেশি। আবার ডবল ফুলও হয়। সরোজিনী নাইডুর ইংরেজি কবিতায় এই ফুলের উল্লেখ আছে। হাওয়ার সংগে দুলে ওঠা পপি ফুল দেখতে ভারী সুন্দর লাগে।

প্যান্‌জি। তিন চার ইঞ্চির ছোট গাছ। ফুলগুলো দূর থেকে দেখতে প্রজাপতির মতো। একটা ফুলের গায়ে বহু রঙ। সূর্য ঘোরার সংগে সংগে এই ফুলও নিজের মুখ ফেরায়। কোনো ধরনের গন্ধ নেই এতে।

ক্যাস্টার। চন্দ্রমল্লিকার মতো দেখতে ক্যাস্টার ফুলগুলো। পাতাগুলো খাঁজকাটা। দেখতে চমৎকার। নানা রঙের ক্যাস্টার পাওয়া যায়। হলুদ রঙ খুব একটা দেখা যায় না।

এছাড়া ডালিয়া চন্দ্রমল্লিকার বর্ণবাহার তো শীতকাল জুড়ে আমাদের চোখকে স্নিগ্ধতা দেয়। গাছভর্তি টিকোমার উজ্জ্বল হলুদ ফুলে মন ভরে যায়। রয়েছে কালেনডুলা, গ্লাডিওলাস, অ্যান্টিরিনাম, লার্কসপার – এসবও এই শীতেরই ফুল।

শীতকালের লনে, যদি নিজের হাতে করা এইসব ফুলের বর্ণ সমারোহ পড়ন্ত রোদে বিকেলের বারান্দায় মনকে অন্য কোথাও নিয়ে যায় তখন নিশ্চয়ই ভাল লাগে। শীতকে ভালবাসতে ইচ্ছে করে। তার রুক্ষতা শুষ্কতা সত্ত্বেও এই রামধনু রঙ আসংগ রচনা করে। তখন প্রিয়সংগীত মধুর হয়ে ওঠে বিদায়ী কোনো পূরিয়ার ধুনের মতো।

চন্দ্রদীপা দাশগুপ্ত

তথ্যসূত্র : শুভঙ্কর পাত্র

ডেলি প্যাসেঞ্জারের শীত



রেল কর্তৃপক্ষের বাঁধা নিয়ম অনুসারে ট্রেন-কামরার বিজলী পাখা নাকি বন্ধ হয় পনেরই নভেম্বর। অর্থাৎ প্যাসেঞ্জারদের কাছে রেলওয়ের আনুষ্ঠানিক শীত ঘোষণা সেদিন থেকেই।

কিন্তু ডেলি প্যাসেঞ্জারের শীত শুরুর তেমন কোনো নির্দিষ্ট দিন নেই। হেমন্তের প্রথম থেকে তাদের সাইড ব্যাগে বা ব্রিফকেসে টুকিটাকির সংগে ছোট ক্যাপ কিংবা মাফলার আসা যাওয়া করতে থাকে। এ সময় হাওড়া-শেয়ালদার প্ল্যাটফর্মে নির্দিষ্ট ট্রেনগুলো ঢুকতেই জানলার ধারে জায়গা পাবার জন্য হুড়োহুড়ি আর তেমন থাকে না। জাঁকিয়ে শীত পড়লে তো কথাই নেই। চাদর মুড়ি দিয়ে তিনজনের সিটে চারজনের ঠেসাঠেসি বসায় কারো বিরক্তির উদয় হয় না। ঘাম, শ্বাসরোধ, ক্লান্তিকর জার্নি তখন কোথায় কি বৃদ্ধ কি যুবা প্রায় সকলেই তখন গরম চা আর ঘন ঘন ধূমপানের আমেজে শীত কাটান।

আজ পর্যন্ত কোনো ডেলি প্যাসেঞ্জারের মুখে শুনলাম না যে, শীতের জার্নি বড় কষ্টের। বরং গ্রীষ্ম বা বর্ষার চেয়ে শীতের ডেলি প্যাসেঞ্জারি অনেক বেশি স্বস্তির। তবে শীতের সকালে ট্রেন ফেল করাটা প্রায় সব ডেলি প্যাসেঞ্জারের ভাগ্যেই ঘটে থাকে। আর ট্রেনে ভোগান্তি যে একেবারেই হয় না তা নয়। অনেক সময়েই রেল কর্তৃপক্ষের জবরদস্ত নিরাপত্তায় ট্রেনের বেশিরভাগ কামরারই জানলার পাল্লা থাকে না। খোলা জানলা দিয়ে হু হু করে ঢোকা ঠান্ডা বাতাস যাত্রীদের বিপর্যস্ত করে



ছবি : নিতাই ঘোষ

তোলে। আবার কখনও লোকাল ট্রেনের রসিক ড্রাইভারসাহেব চলতি গাড়িতে অজান্তে মস্করা করে বিজলী পাখা চালু করে দেন। এছাড়া শীতের রাতে মাঝপথে ডিরেলমেন্ট, আউটার সিগন্যাল খারাপ, ট্রেন থামিয়ে গার্ড সাহেবের শীতের কফির দরদাম করা এসবে আটকে থাকলেই দুর্ভোগ যত বাড়ে। শীতের রাতে ট্রেনে ছিনতাইও আর এক বিপদ। তবু ডেলি প্যাসেঞ্জাররা শীতকে স্বাগত জানায়।

ধরুন, রমণীমোহন মুখার্জি মানে কৃষ্ণনগর ফার্স্ট লোকালের মুখার্জিদা রাত সাড়ে তিনটেয় অ্যালার্ম বাজতেই হুড়মুড় করে উঠে পড়েন এই হাড় কাঁপানো শীতেও। গিন্নি তখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। তাঁকে জাগাতে বাঁ কনুইয়ে দুটো ঠেলা মেরে ডান হাতের তর্জনীতে ঘড়ির অ্যালার্ম সুইচ টিপে ধরেন। আর ওই তর্জনীতেই খাবলা মেরে গুড়াকুর দলা তুলে দাঁতে ঘষতে ঘষতে শৌচাগারে দৌড়। গিন্নি হু হু করে কাঁপতে কাঁপতে লেপের তলা থেকে বেরিয়ে চা করতে গ্যাস ধরান। ততক্ষণে বাইরের উঠোনে টিউবওয়েলের ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ শব্দ, তারপরই হুপুর হাপুর জল ঢালা। সূর্য না উঠতেই সূর্যস্তব শীতের ঠেলায় আপনিই বেরিয়ে আসে গলা দিয়ে।

ভাত খাবার সময় থাকে না মুখার্জিদার। ওসব চলে ক্যান্টিনে। আপাতত: রাতের গড়া বাসি রুটি গরম চা সহযোগে গলাধ:করণ করে ক্রমান্বয়ে ফুলস্লিভ সোয়েটার, তার উপর চাদর, মাথা-কান-গলা ঢাকা বাঁদর টুপি, মোজা-জুতো ও সব শেষে উলের দস্তানায় দুটি হাত মুড়ে বাইসাইকেলের সিটে চেপে এক ঠ্যাং মাটিতে ঠেকিয়ে রেখে যাত্রার প্রাক্‌কালে বউকে একটানা গড় গড় করে আজ কি কি করতে হবে তার ফিরিস্তি দেন। নতুবা সময় কোথায় ? ফেরেন তো রাত ন'টায়। বাড়ির কোনো কাজটাই তো তাঁকে দিয়ে হয় না। তবে তাঁর বুদ্ধিমতী গৃহিণী ঠিক এই সময়টাতে কোনো কথা বলেন না বা কোনো প্রশ্নও করেন না। কারণ এই মুহূর্তে মুখার্জিদার সব উত্তরই হ্যাঁ এবং না-এর মাঝখানে অবস্থান করে। অতএব তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে স্বামীটির কাঁধে একটা ফাঁকা ঢাউস ব্যাগ ঝুলিয়ে দেন। অমনি প্যাডেল ঘোরে। সাইকেল ছোটে স্টেশন মুখো।

এহেন মুখার্জিদাও হেসে বলেন, 'শীতে আমার কোনো কষ্ট নাই।'

পাঠক-পাঠিকারা বোধকরি একটা কথা লক্ষ্য করে থাকবেন – 'ফাঁকা ঢাউস ব্যাগ।' ভাবছেন খামোকা অত বড় ব্যাগ কেন? তাও কিনা ফাঁকা! আহা, ওটাই তো ডেলি প্যাসেঞ্জারের শীতের লক্ষণ। শীত পড়তেই ডেলি প্যাসেঞ্জারের কাঁধের বোঝাটা বেড়ে যায়, ব্রিফ কেসের ওজন দ্বিগুণ হয়। দেখবেন সকালের সেই ফুলস্লিভ-বাঁদর টুপিপরা মুখার্জিদা শেয়ালদা প্ল্যাটফর্মে নামছেন টিপটপ শার্ট প্যান্টে, যেন কলকাতার ফুল বাবুটি। শুধু বেমানান সাইড ব্যাগের ভারে ঈষৎ বাঁকা। খোলসা করে বলি, যাঁরা মেন লাইনে দূরপাল্লায় নর্থ থেকে রোজ আসেন যেমন – কৃষ্ণনগর, বেথুয়াডহরী বা বহরমপুর, তাঁরা ভোরের ঠান্ডায় প্রায় জমে দলা পাকিয়েই আসেন। কিন্তু এ প্রান্তের দমদম পৌঁছতেই সে জমা বরফ গলতে শুরু করে। একে একে গা থেকে খসে পড়ে শীতের গরম পোশাক। তখন তাদের আশ্রয় হয় ওই ফাঁকা ঢাউস ব্যাগে। কারণ জনাকীর্ণ দক্ষিণের এই শহরতলীতে ওগুলো প্রায় অচল। কলকাতায় তেমন ঠান্ডা থাকে না।

শীতে ডেলিপ্যাসেঞ্জারের হাত থেকে সময় চলে যায়। দেরিতে উঠে তাড়াহুড়ো করে বেরোতে গিয়ে বাড়ির অনেক কাজই হয় না। গৃহিণী অসুস্থ হল তো মেজাজ আরো খারাপ হয়। একবার এক ডেলি প্যাসেঞ্জার তাঁর গৃহিণী অসুস্থ থাকায় রাতের ছাড়া বাসি জামা-কাপড় প্রেসার কুকারে সিদ্ধ করতে চাপিয়েছিলেন তাড়াতাড়ি কাচবার আশায়।

তবে ডেলি প্যাসেঞ্জারের কাছে শীত আরামপ্রদই। নবদ্বীপ-হাওড়ার মুরারীবাবু তো রীতিমত বিগ সাইজের থলে নিয়ে গাড়িতে ওঠেন। থলেতে থাকে এয়ার পিলো আর পুরনো খবরের কাগজ। ছারপোকার কামড় এড়াতে বাঙ্কে তা বিছিয়ে নেন। তারপর বালিশ ফুলিয়ে শাল গায়ে টেনে শয়নে পদ্মলাভ। একবার ভাবুন তো!

তবে শীতের রাতে দুম করে বৃষ্টি এলেই যত গন্ডগোল। দেবাশিসবাবু রাত করে ফেরেন বেথুয়াতে। একদিন রাতে ট্রেন থেকে নামতেই হুড় হুড় করে বৃষ্টি। অথচ সকালে তার আভাসটুকুও ছিল না। ফলে এই হঠাৎ আক্রমণে তাঁর কোট-প্যান্ট, কম্ফর্টার, দস্তানা, মোজা মায় চামড়ার শু পর্যন্ত ভিজে ফুলে ঢোল। পরদিন তাঁর অফিস যাওয়াই বাতিল। বাড়ি বসে শুধু হাঁচো আর হাঁচো।

তবে যে যাই বলুন ডেলি প্যাসেঞ্জারের শীতে মজাও আছে। যেমন ধরুন, উলবোনা। মহিলারা এই সময়টাতে তাঁদের শিল্প-নৈপুণ্য, রুচি, একাগ্রতা, উৎসাহ, ধৈর্য, সময়ের সদ্ব্যবহার, প্রভৃতি ভাল ভাল গুণগুলি একসংগে 'শো' করার একটা দারুণ সুযোগ পান। শীতের মরসুমে তাই অপিস মুখো সুগৃহিণীদের কোলে নানান রঙের নানান জাতের বাহারী প্যাটার্ন ট্রেনে যেন ফুলের মেলা বসিয়ে দেয়। একবার এমনই শীতের এক সুন্দর সকালে লোকাল ট্রেনের জানলার ধারে বসে নরম রোদে উল বুনছিল ছিপছিপে শিউলী। কোথা থেকে অঘটন ঘটে গেল। দুষ্টু ব্যারাকপুর লোকালটি এক ঝাঁকুনিতে তার কোলে রাখা উলের গোলাটা ফুটবোর্ডে ফেলে দিতে সেটা গড়িয়েও গেল খানিক। তবে সেটিকে সযত্নে কুড়িয়ে এনে তাকে ফেরত দিল যে শ্যামলা সুদর্শন ছেলেটি। তার দিকে চোখাচোখি হতেই ট্রেনের দুলুনির সংগে শিউলীর ভেতরটাও দোল খেল। কৃতজ্ঞতা ক্রমশ প্রেমে পরিণত হল। পরিণয় সারতেও তারা বেশি সময় নেয়নি।

শীতের আর এক মজা পিকনিক। শীত পড়তেই ডেলি প্যাসেঞ্জার মহলে পিকনিকের ধুম পড়ে যায়। পিকনিক কবে হবে, কোথায় হবে, কী মেনু থাকবে, কে রান্না করবে ইত্যাদি ইত্যাদি সাতখান আলোচনাতেই তাঁরা একমাস কাটিয়ে দেন। এরপর চাঁদা তোলা তো আছেই। বলতে পারেন পিকনিক নিয়েই ডেলি প্যাসেঞ্জাররা একটু নড়ে চড়ে বসেন। এই একটা সময়ে সকলের সংগে বৌ বাচ্চা নিয়ে হুল্লোড় তাঁদের কাছে অনেকটা রি ইউনিয়নের মতোই। অভিধানে না থাকলেও ডেলি প্যাসেঞ্জাররা তাঁদের এই টানা-হ্যাঁচড়া জীবনযাত্রাকে 'ডেলি পাষন্ডগিরি' বলে অভিহিত করেন। এইসব পাষন্ডদের বউরা যারা সিকিভাগটুকুও স্বামীদের কাছে পায় না। তারা এই পিকনিকে তাদের সারা বছরের অভাব অভিযোগ শেয়ার করে অন্যান্য ঘরণীদের সংগে বোধহয় ডেলিপ্যাসেঞ্জারের পারিবারিক জীবনেও এই শীতেই একটু রং প্রলেপ পড়ে যে রঙে নিজেদের রাঙিয়ে নিয়ে তাঁদের সারাটা বছর চলে

সুভানু ভট্টাচার্য

পা বাড়ালেই শীতের চড়ুইভাতি

শীত আসছে। এই তো সময়। দল বেঁধে বেরিয়ে পড়ুন কাছে অথবা দূরে। সকালের কুয়াশা, কমলা রোদ, ধূ ধূ মাঠ, খেজুরছায়া আর প্রিয় বান্ধবীর দুরন্ত ককটেলে জমে যাবে পৌষের পিকনিক, শীতের হুল্লোড়। বেরিয়ে পড়ুন। শুধু বেরিয়ে পড়ার ইচ্ছেটা চাই। দরজা জানলা দুহাট খুলে হারিয়ে যান যেখানে খুশি। বাড়ির কাছেই আরশিনগর, ভুবনডাঙা যত্রতত্র। এদেশে মাঠের অভাব? নদী? নেহাত পুকুর কিংবা ডোবা? বনভোজনের মজাই আলাদা যদি সংগে থাকে মনের মতো বন্ধু-সুজন।

শীত এলেই গুটি গুটি উঁকি মারে চড়ুইভাতির স্মৃতি। সত্যি কী মজাটাই না হয়েছিল সেবার। ভোর ভোর সবাই তৈরি। সংগে থালা, বাটি, সবজি আনাজ, মাংস, হলুদ, নুন, লংকা, এমন কি ঘুটে কয়লাও। সঞ্চিতা তো পারলে বাড়ির কুকিং রেঞ্জটাই সংগে করে নিয়ে যায়। ভাগিস সুস্মিত একটা ম্যাটাডোর জোগাড় করে রেখেছিল।

ব্যান্ডেল পেরিয়ে কুন্তিঘাট পৌঁছতে পৌঁছতে প্রায় নটা। কুন্তি নদীর পাড় ঘুরে ঘুরে মনপসন্দ জায়গা একটা খুঁজে নিলেই হলো। সারা বছর মনের মধ্যে পিকনিক পিকনিক খেলাটা এতদিনে এই মিঠাই দুপুরে যেন শরীর পেয়ে গেল। সারাদিন শুধু মজা আর মজা। মাংসটা সেদ্ধ হলো না। চাটনিতে কে যেন দুষ্টুমি করে চিনির বদলে নুন দিয়ে গেছে। হেড কুক কর্মটা তো রেগে লাল। পত্রালী কুটোটিও নাড়েনি। জামাইবাবুর মিনোল্টা ক্যামেরা নিয়ে সারাদিন শুধু বেঁকেচুরে ছবিই তুলেছে। লাট্টুটা একদম বোকা। মেয়েদের কাছে হিরো হবার লোভে নদী থেকে কলসি কলসি করে জল তুলেছে একাই। মিস্টুন দেখেও দেখেনি।

রান্না শেষ। হুররে মল্লিকা বলে নদীতে ঝাঁপিয়েছে অনিন্দ্য, মেঘদূত, তিলক আর রাতুল। মেয়েদেরও ইচ্ছে ছিল। কিন্তু একস্ট্রা শাড়ি সংগে আনেনি তাই।

খেতে বসে বোঝা গেল ভাত কম। তাতে কী? 'আর দুমুঠো চাল ছেড়ে দে হাঁড়িতে' তারপর যা হবার তা হবে,



বিকেলে অনেকক্ষণ নাকি গৌতম আর চন্দ্রেয়ীকে খুঁজে পাওয়া যায়নি, কেউ কিন্তু খোঁজও করেনি। শুধু মুখ টিপে হেসেছে সবাই।

বেলা শেষ। অন্ধকার ঝুঁকে আসছে নদীর ওপরে। দুপারে প্রসারিত শান্তি। নির্জনে বসে মিতা গাইছে, 'দূরে কোথায় দূরে দূরে/আমার মন বেড়ায় গো ঘুরে ঘুরে'।

ফেরার পথে অভিজিৎ টুম্পার হাতে গুঁজে দিয়েছিল সেই আমোঘ চিরকুট, 'বিষয় ব্যক্তিগত।'

এবারের পিকনিকে ওরাও কিছুক্ষণের জন্য হারিয়ে যাবে। হয়তো গাদিয়ারা অথবা বেথুয়াডহরিতে।

গাদিয়ারা – কলকাতা থেকে মাত্র কয়েক ঘণ্টা। ছোট-খাটো একটা দল হলে ম্যাটাডোর নিলেই ভালো। নচেৎ ধর্মতলা অথবা হাওড়া থেকে বাসও আছে। লজের পাশেই সরকার থেকে তৈরি হয়েছে পিকনিক শেড। বেশ কয়েকটা। সেখানেই পছন্দসই একটা জায়গা বেছে নিন। রূপনারায়ণ আর গঙ্গার সঙ্গমে নদী বিশাল হয়েছে এইখানে। দুপাড়ে বালিয়াড়ি। চড়ুইভাতির পক্ষে আদর্শ।

কোনোকালের এক জমিদারবাড়ি ভেঙে তৈরি হয়েছে টুরিস্ট লজ। দু একদিনের ছুটি কাটানোর পক্ষেও বড় সুন্দর এই গাদিয়ারা সঙ্গম। সকাল সকাল পৌঁছে যাওয়াই ভাল। রান্নার জোগানের ফাঁকে ফাঁকে নদীর পাড় ধরে কাছে দূরে ঘুরে আসা যায়। সঙ্গে ফুটবল অথবা ক্রিকেট সেট থাকলে নদীর পাড়ে খেলা খেলা সারাবেলাও চলতে পারে। সন্ধের মুখে ওপারে সরিষা গ্রামে আলো দেখা যাবে। রূপ-গঙ্গার শীতের পিকনিক থেকে ফিরে যাবে ওরা। শহরে, শব্দের নীড়ে।

ডায়মন্ডহারবার থেকেও ঘুরে আসা যায়। শিয়ালদা থেকে ট্রেনে অথবা বাবুঘাট থেকে ৭৬ নম্বর বাসে গঙ্গার পাড়ে পুরোন কেল্লার আশেপাশে পুরো অঞ্চলটাই পিকনিক স্পট। উনুন পেতে বসে পড়লেই হলো। গঙ্গায় স্নান করার লোভ সামলানোই মুশকিল। কিন্তু সাবধান বিশেষ কাউকে কেরামতি দেখাতে গিয়ে অনেকে আবার অহেতুক বিপদ ডেকে আনে। ছুটির দিনগুলো বাদ দিলেই ভালো। নইলে লরি ম্যাটাডোর আর মাইকের আওয়াজে কান ঝালাপালা হবার জোগাড়, আড়ালে আবডালে কাউকে কোন বিশেষ কথাও গোপনে বলা যাবে না। পিকনিকে আবার চেঁচিয়ে বলা যায় না।

বেথুয়াডহরি – অরণ্য না বলা গেলেও জঙ্গল তো বটেই, ধর্মতলার দূরপাল্লার





ফটো : সৌগত রায় বর্মন

বাসের গুমটি থেকে খোঁজ নিন কোন বাস কখন কখন বেথুয়াডহরি হয়ে যায়। সাধারণভাবে উত্তরবঙ্গগামী যেকোন বাসই ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে যেতে যেতে এখানে কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়ায়। কিংবা ভোরের লালগোলা ধরে পৌঁছে যান বেথুয়াডহরি। এছাড়া বহরমপুরগামী স্টেট বাসেও চেপে বসতে পারেন।

জঙ্গলে ফাঁকা জায়গা দেখে চড়ুইভাতির আসর পেতে ফেলুন, খাবার জলের ব্যবস্থা কেয়ারটেকারকে বললে সেই করে দেবে। জঙ্গলে ভয় নেই। হরিণ আছে। সঙ্গে মজা। শখ করে হারিয়ে যান না গাছে গাছে পাতার আড়ালে। ছোটবেলায় হারিয়ে যাওয়া লুকোচুরি খেলাটা আবার না হয় খেলা যাবে এই শালের জঙ্গলে।

বেথুয়াডহরিতে রাতে থাকার ব্যবস্থাও আছে। তবে সরকারি অনুমতির হাঙ্গামাটা মেটাতে হবে আগে। সঙ্গে গাড়ির ব্যবস্থা থাকলে কলকাতায় ফিরে আসা অসুবিধে হবে না।

বনভোজনের জন্য বিশেষ কোন জায়গার দরকার হয় না। পা বাড়ালেই গাছ গাছালি। বালী থেকে দিল্লি রোড ধরে এগোতে এগোতে দুপাশে চোখ খোলা রাখুন। দেখতে পাবেন কোথায় খেজুর গাছের নিবিড় ছায়া কোথাও পুকুর পাড়ের প্রান্তে বট যেন চড়ুইভাতির জন্য সাজিয়ে রেখেছে কেউ।

গঙ্গার দুপাড় জুড়েই উত্তরপাড়া কোন্নগরে ছড়িয়ে আছে পুরোন জমিদার বাড়ি। ভাঙা মন্দির। বারোমন্দিরে বুড়ো শিবের আস্তানা। মন্দিরের আনাচে কানাচে পিকনিকের জন্য অনুমতির দরকার হয় না। পূজারী আর তার চ্যালাকে 'প্রসাদ চড়াতে' পারলেই কাম ফতে।

পুরোন জমিদার বা বনেদি বাড়িতে সারাদিন হুল্লোড়ের জন্য চাই বাড়ির মালিকের অনুমতি। একটু খোঁজ খবর নিলেই ঠিকানা পাওয়া যাবে। না পেলেও ক্ষতি নেই। কেয়ারটেকারকে তোষামোদে খুশি করতে পারলেই হলো।

পারিবারিক চড়ুইভাতির জন্য এ জায়গার কোন জবাব নেই। অফিস থেকে দল বেঁধে কর্তা গিন্নি সহ দল বানাতে পারলে মজা নেহাত কম হবে না। রান্নার জন্য ভাবনা নেই। দত্তদার বউ একাই একশো, তাছাড়া সঙ্গে তো জোগান দেবার জন্য গিন্নিরা আছেনই বাস, আর কী চাই। কর্তাদের লম্বালম্বি তাসের আড্ডা আর টেপ রেকর্ডে কিশোর কুমারের 'সেদিন আজি কোন ঘরে গো খুলে দিলো দ্বার' দুপুরের রোদ মাথায় উঠলে গঙ্গা স্নানটা সেরে ফেলতে হবে, খাওয়া দাওয়া চুকিয়ে ইচ্ছে হলে নৌকো ভাড়া করে কিছুক্ষণ গঙ্গাবক্ষে ঘুরেও আসা যাবে। নৌকো দুলবে। গপ্পে গপ্পে বেলা বেড়ে যাবে। নদীতে নামবে সন্ধ্যা। পৌষের একটা দুপুর চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে স্মৃতির অ্যালবামে।

শীতে শহুরে মানুষ একটা দিনের বাড়ি বানাবে গ্রামে। পিকনিক পিকনিক করে ছুটে যাবে দলবেঁধে। কিন্তু গ্রামের ওরা ? নিশ্চয়ই অ্যাসফাল্টের জঙ্গলে আসবে না বনভোজনের আসরে। তবে শহরের যেমন চড়ুইভাতি, গ্রামের তেমনি পৌষলা, এক এক গ্রামে এক এক রকম। কখনও সমস্ত গ্রাম,

কখনও বা শুধু মেয়েরা বা ছেলেরা অথবা ছেলেমেয়ে একই সংগে গ্রামের প্রান্তে নদীর কিনারায় যাবে, রাঁধবে, খাবে। আসলে চড়ুইভাতি – নাম শুধু পৌষলা। কৃষিজীবী মানুষের 'সংহতি উৎসব'।

একবার চলুন না কাছাকাছি কোন গ্রামে পৌষলা করে আসি।

রোদে আর শব্দে সারা বছর পুড়তে পুড়তে প্রত্যেকেই স্বপ্নে ঘুরে আসে হিমেল কুলু অথবা মানালি নিদেন দার্জিলিং। বাস্তবে হয়তো তেমনটি ঘটে না। গিন্নির অসুখ। কর্তার অফিসে গন্ডগোল। থাক, এবছরটা বাদ দেওয়া যাক। এভাবেই কোন না কোন ঘটনা-দুর্ঘটনায় বছর পেরিয়ে যায়, যাওয়া আর হয় না।

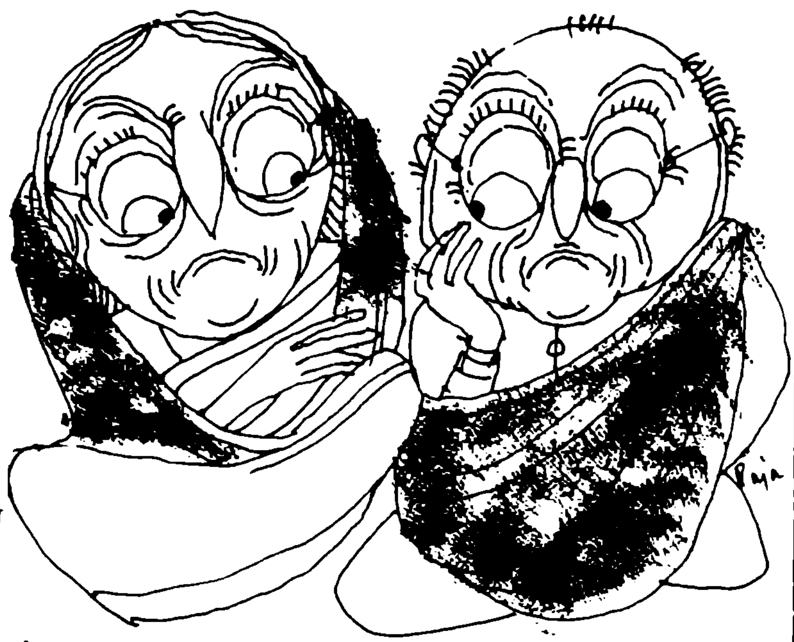
বছর দশেক আগে শেষ পিকনিকে গিয়েছিলাম ব্যান্ডেল চার্চে। তারপর নাঃ আর হয়ে উঠল না।

তবুও তো অফিস ফেরত ঘামে ভিজতে ভিজতে হঠাৎ কোন বাজে বিকেলের মলিন আলোয় মনে পড়ে যায় সেই কবেকার চড়ুইভাতির স্মৃতি, পৌষের ধূ ধূ মাঠ, গাছগাছালির শীত, সাঁঝের কুয়াশা।

যাওয়া হোক না হোক ভাবতে ভালো লাগে পিকনিক মানেই হৈ-হৈ সবার সংগে সবার কানাকানি। □

সৌগত রায় বর্মন

শীতের বুড়োবুড়ি



গল্পটা অনেকেরই জানা। কিন্তু উপায় নেই। এই মুহূর্তে এর চাইতে কোন জুতসই গল্প মাথায় আসছে না। তাই সেই জানা গল্পটা দিয়েই এই লেখা শুরু করার অনুমতি চাইছি। গল্পটা স্রষ্টার এবং সৃষ্টির। বলা যায় ভগবান এবং তাঁর সৃষ্ট ছানাপোনার।

ভগবান প্রথমে সৃষ্টি করলেন একজন মানুষ। তারপর সৃষ্টি করলেন গাধা, একটি কুকুর এবং একটি পাঁচা। ভগবানের স্টকে তখন টোটাল পরমায়ু ছিল ১২০ বছর। তাই তিনি ঠিক করলেন এই টোটাল পরমায়ুটা তাঁর সৃষ্ট চারটি জীবের মধ্যে সমভাবে বণ্টন করে দেবেন। অর্থাৎ এই চারটি জীবের সবারই বয়স হবে ৩০ বছর। এই সিদ্ধান্তের কথা তিনি ওদের মর্তো পাঠাবার আগে জানিয়ে দিলেন এবং বললেন, এ ব্যাপারে তাদের যদি কোন বক্তব্য থাকে সেটা তিনি ধৈর্য সহকারে শুনবেন। প্রয়োজনে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করবেন।

প্রথমে মানুষকে ডেকে জিগ্যেস করলেন, আমার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি তুমি। বলতো এই ৩০ বছর পরমায়ুতে তুমি সন্তুষ্ট? মানুষ সসম্ভ্রমে বলল, ভগবন, আমার কী কাজ? ভগবান বললেন, 'তুমি নিজেকে গড়বে, ঘর-সংসার করবে, পুত্র কন্যার শিক্ষা-দীক্ষার পর বিবাহাদি দেবে এবং নাতি-পুতি নিয়ে শান্তিতে সংসারে বসবাস করবে।'

'এই শর্ট-স্প্যান অব লাইফে এত কাজ করা কি সম্ভব? নিজেকে গড়ব, বিয়ে-থা করব, ছেলেপুলের লেখাপড়া শেখানো, তাদের বিয়ে-টিয়ে দেওয়া – এত কাজ কি এই ৩০ বছরে হয়ে উঠবে?'

– 'তার মানে তুমি আরো পরমায়ু চাইছ

– জগদীশ্বর আমার মনের বাসনা ঠিকই জানতে পেরেছেন।

– ঠিক আছে। তুমি বাঁ দিকে দাঁড়াও।

মানুষকে বাঁদিকে দাঁড় করিয়ে ভগবান গাধা, কুকুর এবং পাঁচাকে সামনে ডাকলেন। গাধাকে বললেন, গাধা, ৩০ বছর পরমায়ু তোমার পক্ষে এনাফ?

আমাকে কী কাজ করতে হবে ভগবন?

– তুমি ভারবাহী হয়ে রবে।

– ৩০ বছর ধরে গুরুভার বইবার মত গুরুতর কাজ করা কি সম্ভব?

– তার মানে, তোমার পরমায়ু আরও কম হলেও চলবে?

– ভগবান, আপনি সর্বজ্ঞ। আপনি ঠিক বুঝেছেন।

– ঠিক আছে, তোমার পরমায়ু ১০ বছর কমিয়ে আমি মানুষকে দিয়ে দিলাম। তোমার কোন আপত্তি নেই তো গাধা?

– আমি বেঁচে গেলাম হুজুর।

ভগবান তাঁর বাঁদিকে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষকে জানিয়ে দিলেন যে তার পরমায়ু দশ বছর বাড়লো। খুশি খুশি মুখ করে জিগ্যেস করলেন, বাছা এবার তোমার হবে তো? মানুষ কোন উত্তর দিল না। অন্তর্যামী বুঝলেন মানুষের আরও পরমায়ু দরকার। এবার তিনি কুকুরকে ডেকে বললেন, তোমার কি কাজ হবে তুমি জান?

– না হুজুর।

তুমি প্রভুভক্তি দেখাবে, তাঁর বাড়ি পাহারা দেবে।

– ক্ষমা দ্যান হুজুর। এ্যাদ্দিন ধরে একাজ পারবো না। আমার থেকে দশ বছর পরমায়ু মানুষকে দিয়ে দিন, বেচারার কাজে লাগবে।

– শোন, মনুষ্য প্রবর, তোমার পরমায়ু আরও ১০ বছর বাড়লো।

মানুষ মুখ গুমড়ে রইলো দেখে পাঁচা এগিয়ে বললো, দেখ, মানুষদা তুমি মুখ গুমড়ে থেকো না। আমার পরমায়ু থেকেও তোমাকে ১০ বছর দিচ্ছি।

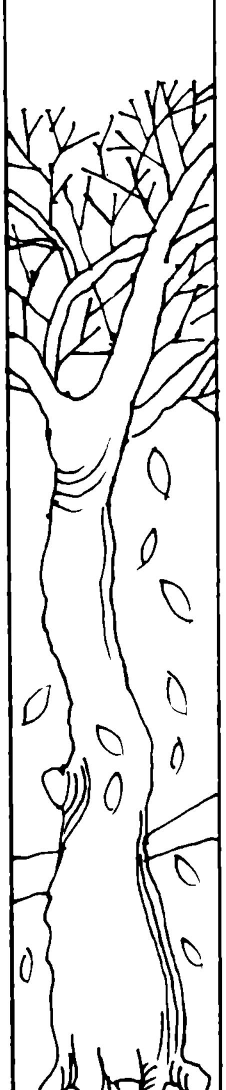
এবার ভগবান বললেন, দেখ মানুষ এবার তোমার পরমায়ু কত হল?

– আজ্ঞে ষাট।

– এর বেশি তো আর কিছু করা যাচ্ছে না।

– 'এতেই চালিয়ে নেব'। এই বলে





মানুষ ভগবানকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে পৃথিবীতে চলে এল। সেই থেকে মানুষের গড় পরমায়ু হল ষাট বছর। এই ষাট বছরের মধ্যে ৩০ বছর হচ্ছে মানুষের অরিজিনাল পরমায়ু। এই সময় মানুষ নিজেকে গড়ে, জীবন যুদ্ধের জন্য তৈরি হয়। ৩০ থেকে চল্লিশ বছর হচ্ছে গাধার পরমায়ু। এই সময় মানুষ গাধার মত খাটে। ৪০ থেকে ৫০ বছর হচ্ছে কুকুরের পরমায়ু। মানুষ এই সময় আনুগত্য দেখায়, বাড়ির লোকরা বাইরে গেলে বিশ্বস্তভাবে পাহারা-টাহারা দেয়। ৫০ থেকে ৬০ বছর হচ্ছে প্যাঁচার পরমায়ু। এই বয়সে মানুষ বাড়ির এক কোণে পড়ে থাকে, মাঝে মধ্যে প্যাঁচার মত হুপ-হাপ শব্দে শুধু জানান দেয় তারা আছে।

তো, আমাদের সংসারের বুড়োবুড়িরা হচ্ছে প্যাঁচার পরমায়ুধারী কিছু মানব-মানবী। সংসারে এদের বিচরণ সংস্কৃতের লুপ্ত অ-কারের মত। অস্তিত্ব আছে গুরুত্ব নেই। এই বয়সে এঁরা পঞ্চপিতার এক পিতা, অনেক মাতার অন্যতমা। ট্যাঁক এবং টেংরির জোর হারানো কিছু মানুষ-মানুষী। এঁদের সব থেকেও কিছু নেই, সবার সঙ্গে থেকেও এঁরা একা। বুড়োবুড়ি এক সঙ্গে থাকলে তবুও কিঞ্চিৎ বল ভরসা থাকে। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় বুড়িহীন অসহায় বুড়ো, কিংবা বুড়োহীন একা বুড়ি। সামাজিক পরিচয়ে এঁরা দাদু-দিদিমা, জ্যেঠা-জেঠিমা, কখনও বা বড়মা ছোটমা। রেশন-কার্ডে হেড অব দ্য ফ্যামিলির ঘরে নাম শোভিত করে অশোভনভাবে একটি ঘর জবর দখল করে আছেন অনেক সংসারে, পরিজনদের চক্ষুশূল হয়ে। একদা শ্রদ্ধাভাজন এই বুড়োবুড়িরা শ্রদ্ধার দুর্ভিক্ষের মাঝে বেঁচে-বর্তে আছেন ভোগী হয়ে। তবে এঁরা অন্য ভোগী – রোগ ভোগী বা দুখভোগী। সুখ ভোগী বুড়োবুড়ি কালে-ভাদ্রে দেখা যায়। আঠের বছর যদি দুঃসহ সময় হয়, তাহলে চারআঠের বাহাত্তর বছরের বুড়ো-বুড়িদের হালটা আঙ্কিক নিয়মেই অবলীলায় হিসেব করা যায়। এবার সেই হিসেবের দিকেই এগোব।

এই হিসেবের আগে একটা কথা বলে নেওয়া দরকার। নতুবা ভুল বোঝাবুঝির একটা অবকাশ থেকেই যাবে। তাহল –আমাদের এই আলোচনায় ডাঁটো বুড়াবুড়িরা আসবেন না। ডাঁটো বলতে তাঁদের কথাই বলছি, যাঁরা কারো তোয়াক্কা না করে ডাঁটে আছেন। রোজ টেংরির জুস খেয়ে টেংরি সিধে করে হাঁটেন, গোটা দুই পেগ হুইসকি খেয়ে সংসারের লোকদের জানাতে পারেন তাঁদের উইস কী। কিংবা যাঁদের ট্যাঁকের জোরের জন্য সংসারে কেউ ট্যাঁক ট্যাঁক করার সাহস পায় না। অর্থাৎ এই আলোচনা ডাঁটোদের নিয়ে নয়, খাটোদের নিয়ে। যাঁরা ট্যাঁকের জোরে খাটো, টেংরির জোরে খাটো, তাঁরাই এই উপাখ্যানের নায়ক-নায়িকা।

এই বুড়োবুড়িদের এখন আর কোন কিছুরই গরম নেই। সব গরম চলে গিয়ে এখন ওঁরা ঝিম মেরে হিম হয়ে গেছেন। এই হিম হয়ে যাওয়া বুড়োবুড়িদের হালটা কেমন হয় এবার সেকথা বলি। তবে সব বুড়োবুড়ির কথা এই স্বল্প পরিসরে বলা সম্ভব নয়। তাই দুটো রিপ্রেজেন্টেটিভ ক্যারেক্টার বা প্রতিনিধি-চরিত্রের মাধ্যমে চিত্রটা তুলে ধরলে কাজটা কিঞ্চিৎ সহজ হয়। বুড়োদের প্রতিনিধি চরিত্র হরিপদবাবুর হাঁপের টানটা শীতের দিনে বাড়ে। দিনের বেলা যেমন তেমন, রাতে বড় কষ্ট। বাড়ির সবাই যখন নাক ডেকে ঘুমোয় তখন তিনি একা ঘরে শুয়ে শুধু কাশেন আর মাঝে মাঝে উঠে গিয়ে জানলা দিয়ে কফ ফেলে আসেন। হাতড়ে হাতড়ে হাঁপানির ট্যাবলেটটা খান। আবার কাশেন। নাক ডাকার শব্দ ভেদ করে হরিপদবাবুর কাশির শব্দ বাড়ির কারো কানে পৌঁছয় না। যতদিন মিসেস হরিপদ বেঁচেছিলেন ততদিন এই সময়টায় উঠে তিনি পুরনো ঘি মালিশ করতেন হরিপদবাবুর বুকে। তাতে টানটা কমতো। এখন সে পাট চুকে গেছে।

হরিপদবাবু চোখে ভাল দেখতে পান না বটে, কিন্তু কানে সব শোনেন, নাকে গন্ধ পান। শীতের সকালে কপি বড়া হচ্ছে। ছোট নাতনি বলছে, মা দাদুকে একটা কপি বড়া দাওনা। মা মেয়েকে ধমক দিয়ে বললেন, তোকে পাকামো করতে হবে না। কপি বড়া খেলে দাদুর পেট গরম হবে না?

হরিপদর মনের কথা হচ্ছে, তা হোক না। একদিন না হয় পেট গরম হলই বৌমা। তিনশ পঁয়ষট্টি দিনতো পেট ঠাণ্ডা রাখার জন্য গড়গড়ে ডবকা-ঝোল খাওয়াচ্ছই। একদিন না হয় একটু ব্যতিক্রম হলই বা। কিন্তু মুখ ফুটে বলার উপায় নেই। মিসেস হরিপদ বেঁচে থাকলে হয়ত বা একটা ডিসে দুটোগরম কপি বড়া এনে তুলে ধরতো। কিন্তু তিনি তো শত্রুতা করে আগেই চলে গেলেন।

শীতের পিঠে-পায়েস হরিপদবাবুর এক সময় বড় প্রিয় ছিল। এখনও তাঁর বাড়িতে পিঠে পায়েস হয়। হরিপদবাবুকেও দেওয়া হয়। তবে সেটা পিঠে পায়েসের প্রতীক – চায়ের চামচে দু চামচ পায়েস সঙ্গে একটা দুধ পুলি। এই গুরুপাক জিনিসটা এই বয়সে গুরুতর হতে পারে, বাড়ির লোকদের এই আশঙ্কায় হরিপদবাবুর হাসি পায়। কিন্তু বড় কথা এখন আর বলতে পারেন না। প্রভিডেন্ট ফান্ড আর গ্র্যাচুইটির পুরো টাকাটা মেয়েদের বিয়ে দিতে খরচ হয়ে যাওয়ার পর তিনি আর বড় কথা কইতে পারেন না। পুরোপুরি ছেলেদের মুখাপেক্ষী। বাড়িতে থেকেও নেই।

তাই এই শীতের দিনে বাইরে কোথাও বেড়াতে যাওয়ার কথাটা মুখ ফুটে বলতে পারেন না। অথচ ভীষণ ইচ্ছে করে হরিপদর, কয়েক দিনের জন্য অন্তত কাছাকাছি কোথাও থেকে ঘুরে আসতে। জল-হাওয়ার বদলে শরীরের হালটা হয়ত একটু ফিরতো, হাঁপের টানটা একটু কমতো। কিন্তু সে কথা বলার সুযোগ পাননা হরিপদ। কারণ এই সময় ছেলে বৌ এল টি সি নিয়ে বেড়াতে যায় রান্নার লোক আর হরিপদকে বাড়ি পাহারায় রেখে। প্যাঁচার পরমায়ুধারী হরিপদ নিষ্ঠাভরে বাড়ি পাহারা দেন। আর এই সময়েই বড় বেশি করে মনে পড়ে মিসেস হরিপদর কথা। তিনি বলতেন, বুড়ো তোমায় আমি হাড়ে হাড়ে চিনি। হরিপদও তাঁকে হাড়ে হাড়ে চিনতেন। নিজের সংসারে পরগাছার মত বেঁচে থাকা হরিপদ এখন আর কাউকে ঠিক ভালভাবে চিনতে পারেন না। সেটা যতটা না ছানির জন্যে, তার চেয়ে অনেক বেশি মানির (Money) জন্যে। চোখে ছানি পড়লেও হাতে মানি থাকলে যে জীবনটা আরেকটু হানিময় (Honey) হতো সেটা হরিপদ বোঝেন। আর সেটা বুঝেই শীতে কুঁকড়ে যাওয়া সংসারে বীতশ্রদ্ধ হেঁপো রুগী হরিপদ হাপুস নয়নে শীতের নির্মেঘ আকাশ পানে চেয়ে চেয়ে ভাবেন এর চেয়ে ভাল অসীম আকাশ।

* * *

এবার বুড়ির প্রতিনিধি-চরিত্রে উপস্থিত করছি সাবিত্রীসুন্দরীকে।

স্বামী প্রাণসুন্দর মারা যাওয়ার পর তিন কুড়ি দু-বছর বয়সী সাবিত্রীসুন্দরীর সংসারে প্রাণের কথা কইবার কেউ নেই, সুন্দরও কিছু নেই। আছে মোটামুটি স্বচ্ছল প্রতিষ্ঠিত তিন ছেলে, যাদের তিনি ভাগের মা। শীতের দিনে সাবিত্রীসুন্দরীর দুটো ব্যথা চাগিয়ে ওঠে। একটা প্রাণসুন্দরপ্রয়াণের, আর

একটা বাতের। এই শীতের দিনেই প্রাণসুন্দর গত হয়েছিলেন আজ থেকে দেড় দশক আগে। সেই থেকে ত্রিশূলের ওপর বসে ত্র্যহস্পর্শের যাবতীয় অশান্তি ভোগ করছেন।

সাবিত্রীসুন্দরী বলেন, আমার তিন পুত্র নয়, ত্রিশূল ত্র্যহস্পর্শ। আমাকে এই ত্রিশূলে চাপিয়ে তিনি স্বর্গে গেছেন। তিন পুত্রের সংসারে আমি মা নয়, বাড়তি একজন। নিত্যদিনই আমায় নিয়ে ঠেলাঠেলি। কথায় বলে না – তিন ঠেলায় ঘর খোদায় রক্ষা কর। নইলে এই যে শীতের শুরুতেই বাতের ব্যথাটা বাড়লো, তোরা তো দেখতে পাচ্ছিস। একবারও কেউ বলেছিস, চল মা তোমায় ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই। কে বলবে ? ছোট ঠিকাদারি করে। এত ছোট কাজের ঠিকা নেওয়ার সময় তার নেই। মেজর নটা-ছটা অফিস। শনিবারে ওভারটাইম। মাকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাওয়ার টাইম কোথায় তার ? বড় শনিবার রাত্তিরে বাড়ি আসে সোমবার কাকভোরে চলে যায়। নিজের ছেলে বৌকেই ভাল করে দেখার সময় হয় না, মাকে কখন দেখবে।

দেড় দশক নিরামিষি খেয়ে পেটে চড়া পড়া সাবিত্রীসুন্দরীর মাঝে মধ্যে একটু ভালমন্দ খেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু সে তো মুখ ফুটে বলার উপায় নেই। তাহলেই শুনতে হবে, এই বয়সে এত খাই খাই করা ঠিক নয়।

শীতের কপি বেগুন বড়ি তেলটা একটু বেশি টানে। সেটা নিশ্চয়ই সাবিত্রীসুন্দরীর দোষ নয়। অথচ নিরামিষি-ঘরের জন্য তেলের বরাদ্দ শীত গ্রীষ্মে একই রকম। ছেলেদের বাড়তি তেলের কথা বলতে সাবিত্রীসুন্দরীর মনে হয় যেন রাজ্য কেন্দ্রের কাছে বাড়তি বরাদ্দ চাইছে। প্রয়োজনের তুলনায় কম তেল এনে দিয়েও ছেলেরা বলে, মায়ের তেলের হাতটা একটু দরাজ। মা জানেন, বাড়িটা ওঁর নামে না থাকলে ছেলেরা এই তেলটুকুও দিত না। (থ্যাংকস টু প্রাণসুন্দর। তিনি বুদ্ধি করে এই কাজটা করে দিয়ে গেছেন)। যেমন জোটেনা এই শীতের দিনে পাতে খাওয়ার একটু ভাল ঘি। তাই প্রাণে ধরে শেষ করতে পারেন না পুরনো ঘিয়ের শিশিটা। রোজ চন্নামেত্তর মত দুফোঁটা ভাতে ছেটান আর প্রাণসুন্দরের জন্য আক্ষেপ করেন।

ছোট নাতির বয়সী লেপটা এখন সাবিত্রীর গায়ে ফোটে। গত বছর বলে বলেও হয়নি। এবার হবে কি না কে জানে। নিজেদের বিছানা পত্তর বৌ-মারা ফিটফাট রাখে। কিন্তু মায়ের বিছানা পত্তরের ব্যাপারে তাঁদের কোন খেয়াল নেই। যেমন খেয়াল নেই নিরামিষি ঘরে এই শীতে একটু বাড়তি দুধ চিনি নারকেল দেওয়ার কথা। ওদের সব চলে, সাবিত্রীসুন্দরীর বেলায়ই যত হিসেব।

সহৃদয় পাঠিকা, স্বল্প পরিসরে প্রতিনিধি চরিত্রের মাধ্যমে সব বলা যায় না। তাই হয়ত শীতের বুড়োবুড়িদের সম্বন্ধে অনেক কিছুই বলা হল না। অনেক অভিজ্ঞতার কথাই লেখা গেল না। সেই অতৃপ্তিটা রয়েই গেল।

উষা ভৌমিক



শীতের জলসা ঃ কিছু স্মৃতি কিছু সুখ

নিশুতি রাত। ঘোলাটে গ্যাসের আলো। ট্রাম লাইনের তারে ঝুলছে থোকা থোকা কুয়াশা। হিমেল বাতাসে-মেশা কোন এক অজানা আর্তি ছুঁয়ে যাচ্ছে নগরবাসীকে। তারই মধ্যে রাস্তার উপরে দুই ভাঁজ করা হাঁটুর ফাঁকে মাথা গুঁজে একদল মানুষ সমাধিস্থ হয়ে গেছে। হাড় কাঁপানো এই পরিবেশও তাদের চঞ্চল করতে পারছে না। মানুষগুলোর মাথায় জড়ানো শাল আলোয়ান, কান ঢাকা মাফলারে। হাত জড় ভাঁজ করা হাঁটু ঘিরে।

দূর থেকে মনে হতে পারে এরা বোধহয় সমবেত প্রার্থনারত, কিন্তু কাছে এলেই ভুল ভেঙে যায়। সমবেত জনতা কোনো কথা না বললেও নিস্তব্ধ রাতে মাইকে ভেসে আসছে চন্দ্রকোষ বা গোরখ কল্যাণের বিস্তার। শূন্যের ইথারে অবলম্বন পেয়ে ভাসছে সুরের উত্তাপ। মধ্যরাত্রের শীত কোথায় হারিয়ে গেছে। ঘুম পাড়িয়ে শীতকে নির্বিষ করেছে সংগীতের আমেজ।

শীতের কলকাতায় আজ থেকে চল্লিশ বা পঞ্চাশ বছর আগে এই দৃশ্য ছিল স্বাভাবিক। তখন যে কোনো সংগীতানুষ্ঠানে ভেতরের টিকিট কাটা লোকের জন্য যেমন বন্দোবস্ত থাকত।



তেমনি বাইরের শ্রোতাদের জন্যও ব্যবস্থা করা হত লাউড স্পিকারের। সেইসব তাবড় তাবড় ওস্তাদের হয়তো চোখে দেখা যেত না পয়সা ছাড়া, কিন্তু কপর্দকহীন সুর-পাগলও তাঁদের কণ্ঠস্বর মুগ্ধ হয়ে শুনত। শীতরাতে রাস্তায় ফুটপাতে তৃপ্তির প্রবাহ গম গম করত।

এখনো ভাল ভাল গানের জলসা



শীতকালেই হয়। কিন্তু বাইরের মাইকের ব্যবস্থা উঠে গেছে। সেই সংগে উঠে গেছে বহু সম্মেলন সংস্থা। সেদিনের আয়োজনে বাণিজ্যের চেয়ে আত্মিক আবেদন ছিল ঘন, আজ যা হয় তা ঘড়ি মাপা, অনেক সময় বাহ্যিক আড়ম্বরের মূর্ত বিকাশ। সেইদিন নেই, কলকাতার ঘরবাড়ি বেড়েছে। লোকসংখ্যা বেড়েছে, ফলে সেই শীত



ফটো : [illegible] রায়চৌধুরী



নেই। আর নেই সেইসব শিল্পীরা – বড়ে গোলাম, ফৈয়াজ ওংকারনাথ, আলাউদ্দিন, হাফেজ আলি, আবদুল করিম, বিসমিল্লা, কেশরী বাঈ, সরস্বতী বাঈ, বেগম আখতার কিংবা বিরজু মহারাজ বা রোশন কুমারী। এদের সংগেই থাকতেন কণ্ঠে মহারাজ, হীরু গাঙ্গুলি, খেরাকুয়া প্রভৃতি।

কলকাতার শীতকালটাই যেন সুরের কাল। এখনও দেখবেন জলসা হচ্ছে। নানা ধরনের সংগীতের আসর। টাকার খেলা। কিন্তু তা থেকে সরে গেছে আন্তরিকতা, খসে পড়েছে আমেজের উত্তাপ।

তিরিশ বছর আগেও কোনো এক সম্মেলনে হলের ভেতরে হাতে হাত ঘসছি। সোয়েটারের ভেতরে পাঁজরে কাঁপুনি এমন সময় মঞ্চে এলেন সালামত নাজাকত। কেমন করে বন্ধ হয়ে গেল হাত ঘষা। কোথায় গেল শীতের বোধ। ঘড়িতে তখন আড়াইটে। কে যেন আমাকে নিয়ে গেল অমৃতলোকে। যেখানে একমাত্র ঋতু বসন্ত – হৃদয়ের স্রোতে আনন্দ আর আনন্দ। গান যখন শেষ হল তখন ভোর পাঁচটা। মনে হল ঘুম আর জাগরণের এক মধ্যস্তরে বসে আছি। যেখানে শুধু স্বপ্ন। সুখের স্বপ্ন।

ততক্ষণে ভৈরবীর আলাপ শুরু হয়েছে মঞ্চে। শিল্পী বিসমিল্লা, আবার এক অমেয় সিন্ধু সন্তরণ। সম্মেলন শেষ হল সাড়ে সাতটায়।

বাইরে পা দিতে মনে হল শীতের রোদ কী সুন্দর। শীতের এই সকাল কী নিবিড় সুরধ্বনি তুলে বয়ে চলেছে। আধবোজা চোখে হাতে জিলিপির ঠোঙা আর টেবিলে গরম চা।

শীত যেন ছুঁয়ে ছুঁয়ে গান হয়ে স্মৃতি হাতড়ে চলে যায়। পণ্ডিচেরী থেকে ভীষ্মদেব ফিরেছেন। গানের জগতে চিররাজকুমার। কিন্তু তার গান শোনা ওই সাড়ে তিন মিনিটের ৭৮ আর পি এম রেকর্ডে। সুরের স্বাদ কি ঘোলে মেটে। এক শীতের সন্ধেয় একজন হাতে একটা কার্ড ধরিয়ে দিল। যাবে নাকি কার্ডে চোখ বোলাতেই লাফিয়ে উঠলাম। গান গাইবেন ভীষ্মদেব – এবং দীর্ঘ বিরতির পর এই প্রথম একটি আসরে। রক্তের ভেতর শিরশির করে খেলে গেল কেমন এক অনুভূতি। সংগে সংগে তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে কার্ডটা পকেটে নিলাম।

শীতের সন্ধে। শীত বস্ত্র নেই। কোনো সম্মেলনে যাবার মতো পোশাকও নেই। তাতে কি? ভীষ্মদেব আছেন। সেই তো সব। উত্তর কলিকাতা সংগীত সম্মেলনের আসরে যখন পৌঁছলাম লোক থিকথিক করছে।

কিন্তু বোধহয় স্বপ্নভংগ হতে চলল। ক্ষুধার্ত শরীর কাতর হয়ে উঠল। একজনের ঘড়িতে দেখলাম রাত ৯টা শিল্পী আসেননি। দু একজনের হতাশাজনক আলাপ শুনলাম। বোধহয় আর এলেন না। উঠে চলে আসব ঠিক করলাম। বাইরে কনকনে ঠান্ডা। ঘন কুয়াশায় পথঘাট ঢাকা। রাস্তার লোক চলাচল ক্রমশ ক্ষীণ।

আমি তখন থাকি অন্যের বাড়িতে। নিজের বাড়ি-ঘর চাল-চুলো নেই। শীতের রাতে আমার আত্মীয়রা কেউই খাবার নিয়ে আদর করে বসে থাকবে না। রাত দশটার পরই বাইরের দরজা বন্ধ হবে। ভিতরে ঢোকাও যাবে না। কাউকে কিছু বলিনি। আন্দাজ ছিল দশটার মধ্যে ফিরে যাব।

এমন সময় সচকিত করে মাইকে ঘোষণা শোনা গেল। ভীষ্মদেব এসে গিয়েছেন। দয়া করে আপনারা বসুন। এখুনি তিনি আসরে বসবেন।

কোথায় গেল কনকনানির ভয় – খবর না দিয়ে বাড়ি না ফেরার ভয় সবকিছু উপচে প্রবাদপুরুষ ভীষ্মদেব আসরে বসলেন। হাঁ করে বসে আছি পঞ্চম থেকে সুর ধরলেন। তারপর শীত আর রাত জড়াজড়ি করে গড়িয়ে চলল। সম্মোহিত হয়ে ঘড়ি দেখবার অবকাশ পেলাম না। রেকর্ডের সেই বাসি গানগুলো জ্যান্ত হয়ে ঘিরে ধরল অগ্নিশিখার মতো। যার ওমের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেললাম।

যখন ফিরে এলাম নিজের মধ্যে তখন রাত বারটা। শেষ ট্রাম চলে গেছে। বাসও নেই। ট্যাক্সি চড়বার কথা ভাবতে শিখিনি। শীতে হেঁটে ফিরে এসেছিলাম দেড় মাইল পথ। যদিও সে পথ মনে হয়েছিল মধুর। কোথাও শীতের ঝরাপাতা ছিল না। চারপাশে শুধু বসন্তের কিংশুক। পাঁচিল টপকে কিভাবে বাড়ি ঢুকে নিজের বিছানায় আশ্রয় নিয়েছিলাম জানি না। খাওয়া হয়নি সে রাতে, সবচেয়ে বড় কথা খাবার প্রয়োজনই হয়নি।

শীত মনে পড়তেই স্মৃতিতে সুরের ঝংকার হয়। সেদিনের কলকাতা। তানসেন, সদারং, মধ্য কলিকাতা, নিখিল বংগ, উত্তর কলকাতা, সিংহী পার্ক, উত্তরপাড়া, বংগ সংস্কৃতি প্রভৃতি সংগীত সম্মেলন। শীতের ভোরে কখনো ঘুম ভাঙলেই মনে পড়ে 'বাবুল মোরা... '। □

অজয় দাশগুপ্ত

স্বাস্থ্য জিজ্ঞাসা



শীতের অসুখ

শিরোনাম দেখে বিরক্ত হবারই কথা। শীতকালেও আবার অসুখ-বিসুখ বাজারে অঢেল তাজা শাক সবজি, ফল, পাটালি গুড়, লেপ কম্বলের উষ্ণ ছোঁয়া, পিকনিক, ক্রিকেট, বইমেলা – শীতের এতসব হৈ-হট্টমেলার মধ্যে অসুখের কথা বেমানান নয় কি তবু হয়তো এ সময় ডাক্তারদের মাছি মারা অবস্থার কথা ভেবেই ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ভাইরা লম্বা ছুটি নিতে লজ্জা পায় তাই কিছু কিছু অসুখের কথা এসময়ও শোনা যায়। অতএব আসুন, শীতের ত্বক বা চামড়ার সমস্যা দিয়েই শুরু করি।

শীতকালে আবহাওয়া খুব শুকনো থাকে। ফলে ত্বকের আর্দ্রতা কমে যায়। শুকনো খসখসে হয়ে ওঠে ত্বক। অনেকের ত্বক ফেটেও যায়। বিশেষ করে ঠোঁট ও গোড়ালি ফাটে। এ সময় ত্বক পরিষ্কার রাখা উচিত। গ্লিসারিন বা নিমতেলযুক্ত সাবান দিয়ে ধীরে ধীরে মুখ পরিষ্কার করে, ভিজে থাকতে থাকতে অল্প ময়েশ্চারাইজিং ক্রিম বা লোশন লাগান উচিত। রাতে শোবার আগে কোনো ভাল কোম্পানির কোল্ড ক্রিম মাখা যেতে পারে। সপ্তাহে একবার মাস্ক নিতে পারেন। একটা ডিমের কুসুমে কয়েক ফোঁটা মধু ও আধ চামচ অলিভ অয়েল মিশিয়ে চোখের চারপাশ বাদ দিয়ে মুখে মেখে পনের মিনিট রাখতে হবে। তারপর ঠান্ডা জলে ধুয়ে ফেলবেন।

শীতে যাদের হাত, পা ফাটে তারা আগে থেকেই এ ব্যাপারে সাবধান হবেন। পুষ্টিকর সুষম খাবার খাবেন। শীতকালে বিট, গাজর, পেয়ারা সহ নানা ধরনের শাক সবজি বাজারে পাওয়া যায়। পায়ে যাতে ঠান্ডা হাওয়া না লাগে সেজন্য মোজা এবং পা ঢাকা জুতো পরবেন। হাতে পায়ে বারে বারে জল লাগাবেন না, কিন্তু নিয়মিত পরিষ্কার রাখবেন। একটা গামলায় উষ্ণ গরম জল নিয়ে তাতে আধখানা লেবুর রস, দু ফোঁটা অলিভ অয়েল আর ২/৩ চামচ নুন ভাল করে মিশিয়ে হাত বা পা পনের মিনিট থেকে আধঘন্টা চুবিয়ে রাখুন। তারপর ব্রাশ দিয়ে ঘষে ঘষে ময়লা থাকলে তা পরিষ্কার করুন। এবার কোল্ড ক্রিম অল্প পরিমাণ লাগিয়ে দিন। গ্লিসারিন, বাদাম তেল এবং লেবুর রস মিশিয়ে হাতে পায়ে লাগালেও উপকার পাওয়া যায়। তবে খুব বেশি রকম ফেটে গেলে এসবে কোনো কাজ হয় না। তখন উচিত ভাল করে ফাটা জায়গা সাবান বা স্যাভলন দিয়ে পরিষ্কার করে 'বোরো গ্লিসারিন' বা 'ইউরিয়া লোশন' লাগানো। এ দুটি ওষুধের দোকানে পাওয়া যায়।

আরেকটা ভাল ওষুধের নাম করছি, কটারিল মলম (COTARYL)। এতে ইউরিয়া ছাড়াও ল্যাকটিক অ্যাসিড গ্লিসারিন, অ্যামোনিয়াম, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম এককথায় ত্বকের পুষ্টির সব কটি উপাদানই থাকে। শীতকালে বেশি পরিমাণে ক্যালসিয়াম খাওয়া উচিত। দুধ, দই, ছানা ও সবুজ শাক সবজিতে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম পাওয়া যায়।

বর্ষাকালের পরেই শীতকালে চর্মরোগ বেশি হয়। কারণ শীতের ভয়ে জুজু হয়ে অনেকেই নিয়মিত স্নান করেন না, করলেও ভাল করে পরিষ্কার করেন না হাত, পা এবং দেহের চামড়া। ফলে দেহের নানা সন্ধিস্থল যেমন বগল, গলা, ঘাড় কুচকিতে ময়লা জমে থেকে ফাংগাস, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস এদের বংশবৃদ্ধির জন্য আমন্ত্রণ জানায়। ফলে দাদ, হাজা এসব রোগ দেখা দিতে পারে। ডাক্তার দেখিয়ে সঠিক রোগ নির্ণয় করে তবেই চিকিৎসা করাবেন। মাইকোনাজল, কোট্রাইমাজোল ও টলনাফেট জাতীয় মলম দাদ ও হাজায় ভাল কাজ করে। কিছু করণীয় অবশ্যই আছে। রোজ গা পরিষ্কার করে ভাল করে স্নান করা উচিত। জাঙিয়া, গেঞ্জি, মোজা কেচে পরা উচিত। ফুটপাথে যে সব ব্যবহৃত গরম পোশাক ঢেলে বিক্রি হচ্ছে, সেগুলো এড়িয়ে চলাই ভাল। গরম পোশাক সবসময় গায়ে রাখা উচিত নয়। স্নানের আগে আধঘন্টা তেল মেখে রোদে বসতে পারলে ভাল হয়। আরেকটা কথা, দাদ হাজা কমাতে ট্রেনে বা রাস্তাঘাটে যে সব মলম বা লোশন বিক্রি হয়, সেগুলো কখনই ব্যবহার করবেন না। এবারে আসি চুলের সমস্যার কথায়।

শীতের আর এক সমস্যা খুশকি। চুলে খুশকি সারাবছরই হতে পারে, তবে শীতকালের শুকনো আবহাওয়ায় খুশকি বেশি হয়। একজনের মাথা থেকে আরেকজনের মাথায় ছড়িয়ে পড়ে। এর প্রধান কারণ অপরিচ্ছন্নতা এবং সুষম খাদ্যের অভাব। বাজারে খুশকি দূর করার বহুরকম শ্যাম্পু পাওয়া যায়। পরপর তিনদিন ব্যবহার করবেন। খাদ্যের মধ্যে কমলালেবু, বিট, গাজর, সবুজ শাক সবজি বেশি করে খাবেন। ভাল করে মাথা পরিষ্কার করে নারকেল তেলে কর্পূর মিশিয়ে মাথায় মাখলেও খুশকি দূর হয়। লেবুর রস মাথায় মেখে দু এক ঘন্টা রেখে শ্যাম্পু করে ফেললেও ভাল ফল পাবেন।

চুলে উকুন থাকলে সাবধান। উকুন মারার বহু ওষুধ বাজারে পাওয়া যায়। সেগুলো ব্যবহার করলে উকুন মরে ঠিকই, কিন্তু চুলেরও ক্ষতি হয়। চুল বিবর্ণ হয়ে যায়, উঠে যায়। অন্য কিছু উপায়ের কথা বলি – ক) পুরনো তেঁতুল ভিজিয়ে, তার সঙ্গে ১ চামচ ভাজা মেথি গুঁড়ো করে মিশিয়ে সারা মাথায় মেখে আধ ঘন্টা রেখে ধুয়ে ফেলুন। খ) একমুঠো তুলসীপাতা বেটে, ১ চামচ মধু মিশিয়ে ভাল করে চুলে বিলিকেটে লাগিয়ে দিন। সারারাত মাথায় পাতলা তোয়ালে জড়িয়ে রেখে সকালে শ্যাম্পু করে ফেলুন। সপ্তাহ তিনেক এ পদ্ধতি চালাতে হবে। গ) পানপাতা বেটে কর্পূরের সঙ্গে মিশিয়ে রাতে সারা মাথায় লাগিয়ে রেখে পরের দিন শ্যাম্পু করে ফেলুন।



চুলের আর এক সমস্যা খুশকি

শীতের শুরুতে হাঁচি, কাশিতে ভোগেন অনেকেই, বিশেষত যাঁদের ঠান্ডার ধাত আছে। দেখা গেছে ঠান্ডা পড়ার মুখে রাত জেগে ঠাকুর দেখে অনেকেই কাহিল হয়েছেন। কাজেই গলায় মাফলার জড়িয়ে রাখবেন, উষ্ণ জলে স্নান করবেন। ওষুধপত্র না খেলেও দিন সাতেকের মধ্যে এসব সমস্যা চলে যায়। তবু যদি কারো বাড়াবাড়ি হয়, যেমন নাক বন্ধ থাকা, দিনে একশ আটটা হাঁচি, নাক দিয়ে কাঁচা জল কি মাথা ভার, গলা ভেঙে যাওয়া – দু একটা ওষুধ ব্যবহার করতে পারেন। নাকের ড্রপ দিনে দু ফোঁটা করে তিনবার, অ্যান্টি হিস্টামিনিক ও প্যারাসিটামল বড়ি, নুন জলে গারগল, ফুটন্ত জলে পাঁচ ফোঁটা বেঞ্জিন দিয়ে নাকমুখে ভাপটানা – এসব করলেই অনেক আরাম পাওয়া যায়। নিরুপায় হলে ডাক্তার তো আছেই।

শীতে হঠাৎ জ্বর আসতেই পারে। সর্দি নেই, কাশি নেই হঠাৎ হু হু করে জ্বর এল। বাড়তে বাড়তে একশ তিন চার। দিন তিনেক পার হয়েও কমবার কোনো লক্ষণ নেই। শীতের শুরুতে এরকম জ্বর অনেকেরই হচ্ছে। কেউ ভাবছেন ম্যালেরিয়া, কেউ টাইফয়েড। মাঝে মাঝে কাঁপুনি হচ্ছে। গা, হাত, পায়ে অসহ্য ব্যথা। কিন্তু এটা 'ভাইরাল ফিভার'। কোনো অ্যান্টিবায়োটিক ক্যাপসুল খাবার প্রয়োজন হয় না। উপসর্গ অনুযায়ী চিকিৎসা করতে হয়। রুগীকে প্রচুর জল, ফলের রস খাওয়াতে হবে। ভাল করে গা স্পঞ্জ করে দিতে হবে উষ্ণ জলে। মাথা ঠান্ডা জলে ধোয়াতে হবে, প্রয়োজনে মাথায় আইসক্যাপ দিতে হবে। প্যারাসিটামল, অ্যাসপিরিন জাতীয় বড়ি দিতে হবে। সহজ পাচ্য খাবার খাওয়াতে হবে।

এবার বলি অন্য উপসর্গের কথা। যেমন, হাঁপানি। তবে হাঁপানি কী, কেন হয় এসব নিয়ে এখানে আলোচনা না করে দু চারটে কাজের কথা বলি। অনেকেরই শীতকালে হাঁপানি বাড়ে। কাজেই সাবধান হওয়া উচিত আগেই। ঠান্ডা না লাগানো, গরম জলে স্নান করা ছাড়াও খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে কিছু সাবধানতা অবশ্যই অবলম্বন করা উচিত। মুলো, কপি না খাওয়াই ভাল। কোন সময়ই পেট ঠেসে খাবেন না, বরং বারে বারে খাবেন। রাতের খাওয়া আটটার মধ্যে সেরে নেবেন। সকালে কিছু যোগব্যায়াম প্রধানত প্রাণায়াম করবেন। কী কী আসন করা উচিত সে ব্যাপারে ট্রেনারের পরামর্শ নেবেন। ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কখনই স্টেরয়েড (বেটনিসল, ডেকাড্রন) খাবেন না। অনিয়মিত স্টেরয়েড খেলে বা নিয়মিত বেশি খেলে শরীরের অপূরণীয় ক্ষতি হয়। কাজেই সাবধান!

শীতকালের অসুখ বিসুখ নিয়ে আলোচনা আরও বাড়িয়ে পাঠক-পাঠিকার মনের অসুখ নাই বা তৈরি করলাম। শীতকাল যে বড় সুখের সময়, অসুখের বেরসিক থাবা এড়িয়ে বরং সুখে থাকুন।

ডাঃ অমিতাভ ভট্টাচার্য


স্বচ্ছতা
নিঃসন্দেহে ইয়েরা
কাচের জিনিষপত্রের জগতে একটি অনন্য নাম—ইয়েরা।
কী সৌন্দর্য্যে, কী স্বচ্ছতায়, কী গুণগত উৎকর্ষে,
ইয়েরার শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে কোনো প্রশ্নই ওঠে না।
ইয়েরা—ভারতে তৈরী উৎকৃষ্ট কাচের জিনিষপত্রের
অতুলনীয় সমাহার।
Yera
GLASSWARE
ইয়েরার চেয়ে সেরা আর কিছু পাবেন না।
Marketed by Darshak Ltd.

শীতের রূপচর্চা

শীতের উত্তরে হাওয়া যেমন আমাদের কাছে বয়ে নিয়ে আসে নতুন নতুন শাকসবজি, ফলমূল, নলেন গুড় কিংবা পায়েস, মোয়া খাওয়ার আনন্দ, ছুটির দিনে চড়ুইভাতির উত্তেজনা, তেমনি এইসময় নতুন সোয়েটার, শাল গায়ে দিয়ে মনোহারী সাজপোশাকে নিজেকে উজ্জ্বল করে তোলার পক্ষে এই হাওয়াই হয় প্রতিবন্ধক। শীতের প্রকৃতি যেমন হয়ে ওঠে শুষ্ক-রুক্ষ, তার প্রভাবে আমাদের অবস্থাও হয় ঠিক তেমনি। চোখ, মুখ, চুল, সবেতে একটা শুকনো উসকো খুসকো ভাব, গা-হাত-পা খসখসে হয়ে যাওয়া কিংবা ফাটতে শুরু করা ইত্যাদি। শীতের এইসব সমস্যাগুলিকে কীভাবে কাটিয়ে ওঠা যায় কিংবা সব কাজের মধ্যেও নিজের সৌন্দর্যটিকে কীভাবে ধরে রাখা যায় এ প্রসঙ্গে কিছু জানার জন্য বিউটিশিয়ান বন্দনা বাগচি-র সঙ্গে একটি অন্তরঙ্গ আলাপচারিতায় সুকন্যার প্রতিনিধি।



সুকন্যা : শীতের প্রসাধনী বা রূপচর্চার ক্ষেত্রে সবচেয়ে জরুরি বিষয় কোনটি বলে আপনি মনে করেন ?

বন্দনা : কোনরকম রূপটান বা বাহ্যিক প্রসাধনীর আগে নিয়মিত ব্যায়াম এবং খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে এই সময় বেশি সচেতন হওয়া দরকার বলে মনে করি। শীতের সময় নানাজনের নানা ধরনের সমস্যা হয়। ধরুন, কারুর ত্বকের সমস্যা, কারুর বা হজমের সমস্যা, কিংবা ওভার অল চেহারায় একটা রুক্ষতা আসা ইত্যাদি ইত্যাদি। এসব কিছুকেই প্রতিরোধ করার প্রথম এবং প্রধান অস্ত্র হল নিয়মিত ব্যায়াম। এক্ষেত্রে জগিং-এর ভূমিকা খুবই উল্লেখযোগ্য। আর শীতের দিনে প্রচুর খাবার দাবার পাওয়া যায় বলেই পরিমিত আহারের ব্যাপারে সচেতন হওয়া দরকার। কারণ, হজমের গন্ডগোল বা অতিভোজনে স্থূলকায় হয়ে পড়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা এসময় দেখা যায়। এবং এই দুটিই চেহারার স্বাভাবিক শ্রী নষ্ট করে।

সুকন্যা : তাহলে এ সময় কোন কোন জিনিস খাওয়া উচিত, কোনটা নয় ?

বন্দনা : এই সিজনের আনাজ, ফল সবই উপকারি। যেমন, পালংশাক, গাজর, বিন, বাঁধাকপি। কিন্তু ফুলকপি, মূলো যদিও সিজনাল, তবুও এগুলো কম খেতে পারলেই ভাল। আর ফলের দিকে কমলালেবু, আপেল তো আছেই। তবে একটা জিনিসের কথা অবশ্যই আলাদাভাবে উল্লেখ করব, সেটা হল টম্যাটো। শীতের সময় টম্যাটোর দাম খুব একটা বেশি থাকে না। কিন্তু এর উপকারিতা অসামান্য। ধরুন, একজন মধ্যমবর্ণা মহিলা, রোজ অফিস কাছারি করেন।

নিয়মিত রোদের তাতে তাঁর গায়ের রঙ কিছুটা অনুজ্জ্বল হয়ে পড়াই স্বাভাবিক। ইনি যদি শীতের সময় নিয়মিত এক কাপ করে টম্যাটো জুস খেতে পারেন, তবে কিছুদিনের মধ্যেই দেখতে পাবেন ত্বক কতটা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এটা আর কিছু নয়। সুস্বাস্থ্যের স্বাভাবিক দীপ্তি। তাই বলছি – স্বাস্থ্য রক্ষার ক্ষেত্রে টম্যাটোর কোনো জুড়ি নেই।

সুকন্যা : শীতের সময় ত্বকের যে নানারকম সমস্যা দেখা যায়, সেটা কি কমবেশি সকলেরই হয় ? সব বয়সেরই ?

বন্দনা : অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের এই সমস্যা সাধারণত কমই হয়। মাঝবয়স থেকে শুরু করে, যেমন ধরুন, ৩০ বছরের পর থেকেই এই সমস্যা বাড়তে থাকে। কারণ, এই সময়ের পর থেকে শরীরের স্বাভাবিক তৈলাক্তভাব কমতে শুরু করে।

সুকন্যা : শীতের সময় তেল মাখা কি জরুরি ?

বন্দনা : হ্যাঁ নিশ্চয়ই। শীতের সময় গায়ে তেল মাখা খুবই জরুরি।

সুকন্যা : আজকাল অনেকেই বলেন, তেল মাখলে গায়ের রঙ কালো হয়ে যায়, এ সম্পর্কে আপনার কী মত ?

বন্দনা : না, তেল মাখলেই যে গায়ের রঙ কালো হবে, এমন কোন মানে নেই। আমরা সাধারণত স্নান করতে যাওয়ার আগের মুহূর্তে গায়ে খানিকটা তেল বুলিয়ে নিয়েই জল ঢেলে ফেলি। ফলে অতিরিক্ত তেল দেহের অনাবৃত অংশের ওপরে থেকেই যায় এবং এর ওপর খুব সহজে ধুলো ময়লা ধরে। কিন্তু স্নানের অন্তত ১ ঘণ্টা আগে ভাল করে তেল ম্যাসাজ করে আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর ঈষদুষ্ণ গরম জলে সাবান মেখে স্নান করলে অতিরিক্ত তেল জমে থাকার সুযোগ থাকে না। ফলে ধুলো ময়লাও জমতে পারে না। সাবান যে গ্লিসরিন হতেই হবে এমন কোনো মানে নেই।

সুকন্যা : আচ্ছা ধরুন, যাঁরা তেল মাখা পছন্দ করেন না, বা স্নানের আগে শরীরচর্চার জন্য ১ ঘণ্টা সময় ব্যয় করার সুযোগ পান না, তাঁদের জন্য আপনার পরামর্শ কী ?

বন্দনা : হ্যাঁ, সময় অল্প, অথচ নিজেকে সুন্দরও রাখতে হবে। এর জন্য বাড়িতে রাখুন কয়েক আউন্স লিকুইড গ্লিসারিন গোলাপ জল। কোনটার দামই খুব একটা বেশি নয়। স্নানের পরই সমান পরিমাণ গ্লিসারিন এবং গোলাপ জল মিশিয়ে সারা গায়ে মেখে নিন। এর ওপর আর জল ঢালবেন না। কয়েক মিনিট পরে নরম তোয়ালে দিয়ে আস্তে আস্তে চেপে চেপে অপ্রয়োজনীয় জল তুলে ফেলুন।

সুকন্যা : কোল্ড ক্রিম ব্যবহার করার পদ্ধতি সম্পর্কে আপনার অভিমত ?

বন্দনা : রাত্রে শুতে যাওয়ার সময়, সামান্য গরম জলে মুখ ধুয়েই তবে ক্রিম ব্যবহার করা উচিত। এ সম্পর্কে একটা ক্রিমের নাম করতে পারি, 'স্যানেলা'। এটি আমাদেরই তৈরি। বাজারে এর দাম মাত্র সতের টাকা, কর আলাদা।

সুকন্যা : এর পরের প্রশ্ন কিন্তু একটি বড় সমস্যা নিয়ে। শীতকালে পায়ের পাতা, পায়ের গোড়ালি ইত্যাদি ফাটা, প্রায় বেশিরভাগ মহিলারই সমস্যা। অথচ এটি উপশম করার সমহজ উপায় অনেকেরই জানা নেই।

বন্দনা : পা ফাটা এড়ানোর জন্য, অতি অবশ্যই মোজা ব্যবহার করুন। এতে যাঁদের পা ফাটার ধাত, তাঁরা ধুলো ময়লা থেকে অনেকটা রেহাই

পেতে পারেন। পা ফাটা এড়ানোর প্রথম উপায়, যথাসম্ভব পা পরিষ্কার রাখা। যেসব মহিলাকে রোজ অফিস কাছারি করতে হয়, মোজা পরলেও তাঁদের পক্ষে পা ঠিকমত পরিষ্কার রাখা সম্ভব হয় না। তাই রাত্রে বাড়ি ফিরেই চট করে খানিকটা গরম জল করে ফেলুন। হাতে-সওয়া গরম জলে সামান্য নুন আর শ্যাম্পু ফেলে দিয়ে বেশ খানিকক্ষণ পা দুটো ডুবিয়ে রাখুন। (সাবান ব্যবহার না করাই ভাল, বেশি সাবান ব্যবহার করলে ত্বকে রুক্ষতা আসার সম্ভাবনা থাকে।) এরপর ব্রাশ জাতীয় কিছু দিয়ে ঘষলেই পা পরিষ্কার হয়ে যাবে। তারপর ভিংকোল্ড ধরনের কোন কোল্ড ক্রিম পায়ে ভালো করে লাগিয়ে সম্ভব হলে সুতির মোজা ব্যবহার করুন। একেই বলে 'পেডিকিওর' করা। এর আরো একটা বিশেষ উপকারিতা হল, বয়স্ক মহিলা যাঁরা কর্মজীবনের অত্যধিক দৌড়ঝাঁপে রাত্রে কোমর-পায়ের যন্ত্রণায় কষ্ট পান, তাঁরা নিয়মিত এটা করলে এই যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাবেন এবং এতে ভাল ঘুমও হবে।

সুকন্যা : মুখশ্রী অটুট রাখতে যেসব মহিলারা খুবই সচেতন এবং তার জন্য নিয়মিত যাঁরা পার্লারে গিয়ে থাকেন, তাঁদের জন্য একটি প্রশ্ন, এই যে 'ফেসিয়াল' বা 'ব্লিচ' করানো, এগুলি কি শীতে বেশি প্রয়োজন ?

বন্দনা : দেখুন আমার মনে হয় গরমকালে ব্লিচ করা বেশি প্রয়োজন। কারণ ব্লিচ করার অর্থ ত্বক পরিষ্কার করা। গরমকালে সূর্যের কড়া রোদে আমাদের রঙ পুড়ে যায়। ত্বকের ছ-টা স্তর থাকে। ব্লিচ করলে ওপরের মলিন স্তর সরে গিয়ে ভেতরের পরিষ্কার স্তর বেরিয়ে আসে। ফলে তখন উজ্জ্বল দেখায়, তাই বলে, কেউ যদি ফর্সা হওয়ার জন্য এক সপ্তাহ বাদে বাদেই ব্লিচ করাতে শুরু করেন, তাতে কিন্তু কিছুদিন পরেই আসল ত্বক আঘাতপ্রাপ্ত হয়। ফলে



ম্যাসেজ করা হচ্ছে

তখন গায়ের রঙ আর ফর্সা না হয়ে কালচে হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। শীতকালে মাঝে-সাঝে ব্লিচ করালেও করাতে পারেন, তবে আমি বলব এসময় ফেসিয়াল করালেই ভাল।

সুকন্যা : এবার চুলের সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন। চুলে তেল মাখা কি একান্তই প্রয়োজন ? শীতে চুল কি বেশি নোংরা হয় ?

বন্দনা : দেখুন, তেল হচ্ছে একটি ভাল কন্ডিশনার। তাই নিয়মিত চুলে তেল মাখা জরুরি। বিশেষত বিভিন্ন কাজে যাঁরা খুব বেশি বাইরে ঘোরেন তাঁদের । সূর্যের আলো এবং ধুলো ময়লায় তাঁদের চুলের স্বাভাবিক তৈলাক্ত ভাব কমে যায়। ফলে চুল খসখসে বা লালচে হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই তেলে অ্যালার্জি না থাকলে তাঁদের পক্ষে তেল ব্যবহারই উপযুক্ত। আর অন্তত সপ্তাহে একদিন ভাল কোন শ্যাম্পু ব্যবহার করে চুল ধুয়ে ফেলুন। আপনাদের পাঠক-পাঠিকাদের 'শানেলা' শ্যাম্পুর কথা জানাতে পারেন। দামটা একটু বেশি অবশ্য ৩০ মিলি – ৬ টাকা। অন্য শ্যাম্পুর মত এতে কোনো ডিটারজেন্ট নেই বরং চুলের জন্য প্রয়োজনীয় অ্যাসিডটি দিয়েই এটি তৈরি ; তাই এটি চুলের স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য রক্ষা করতে সাহায্য করে। আর আপনার পরের প্রশ্ন সম্পর্কে বলি, শীতে চুল কেন সবই বেশি নোংরা হয়। তাই তেল এবং সাবান দুইই নিয়মমাফিক ব্যবহার করলে চুল বা শরীর কোনটাই রুক্ষ হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে না।

সুকন্যা : আচ্ছা মিসেস বাগচি, সাজগোজ করতে আমরা

ব্লিচ করা হচ্ছে



মেয়েরা কমবেশি সকলেই ভালবাসি। অথচ সাজসজ্জা সম্পর্কে সকলের বোধহয় সঠিক ধারণা নেই। ফলে, কোন কোন সময় তা সৌন্দর্য বৃদ্ধি না করে বরং নষ্টই করে। এ সম্পর্কে আপনার কী মত ?

বন্দনা : দেখুন, আমার মনে হয়, আমাদের মত সাধারণ মহিলারা রোজকার কর্মব্যস্ততায় নিজের সৌন্দর্যরক্ষা বা সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য বিশেষ সময় বা অর্থ ব্যয় করতে পারে না বিশেষ উপলক্ষ ছাড়া রোজ বেরুনোর সময় তাঁরা সাজগোজ যথাসম্ভব কম করলেই ভাল। শুধুমাত্র এক টুকরো তুলোয় ক্লিনসিং মিল্ক দিয়ে মুখটা ভাল করে মুছে নিয়ে হাল্কা করে 'কমপ্যাক্ট' বুলিয়ে নিতে পারেন। এছাড়া নিজের রুচি অনুযায়ী 'লিপস্টিক' আর 'টিপ' ব্যবহার করতে পারেন। অনেকে মুখে তৈলাক্ত ভাবটাই রাখতে পছন্দ করেন, তাঁরা কমপ্যাক্ট না ব্যবহার করে (ক্লিনসিং মিল্ক দিয়ে পরিষ্কার করলে মুখটা বেশ ফ্রেশ দেখায়) যে লিপস্টিকটি লাগাবেন, ওটারই ডগায় আলতো করে তর্জনি বুলিয়ে নিয়ে দুই চোখের ওপরের পাতায় এবং চোখের নিচে গালের উঁচু অংশ থেকে কানের দিকে সামান্য ছড়িয়ে দিয়ে, অল্প শেড দিয়ে নিন।

পছন্দসই টিপ পরুন। চোখে আইলাইনার সরু করে দিলেও দিতে পারেন। চুল ছোট ছোট হলে, ড্রাই সেটিং করা অবস্থায় খোলা থাকলেই ভাল লাগে। বড় হলে পছন্দ সই ছোট খোঁপা কিংবা বেনী শীতকালে দিনের বেলায়ও উজ্জ্বল রঙের শাড়ি-ব্লাউজ ভালো লাগে। এর সঙ্গে কানে ম্যাচিং ছোট টপ, হাতে রঙিন বালা, প্রয়োজন অনুযায়ী হাল্কা স্টোল কিংবা স্কার্ফ গায়ে আলগা ফেলে রাখুন, দেখবেন কেমন সকলের দৃষ্টি কেড়ে নিচ্ছেন। □

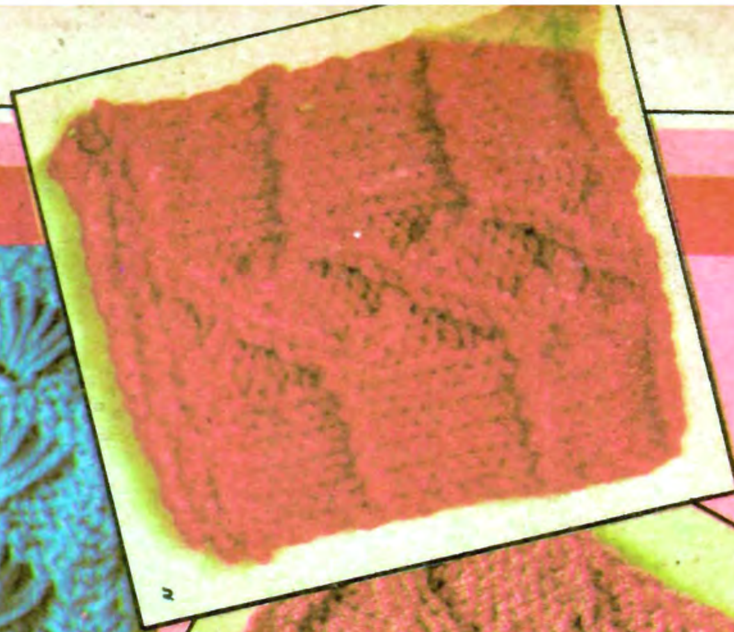
সাক্ষাৎকার : পাঞ্চালী মিত্র

সৌজন্য : লা বেলা, কলকাতা ১৪

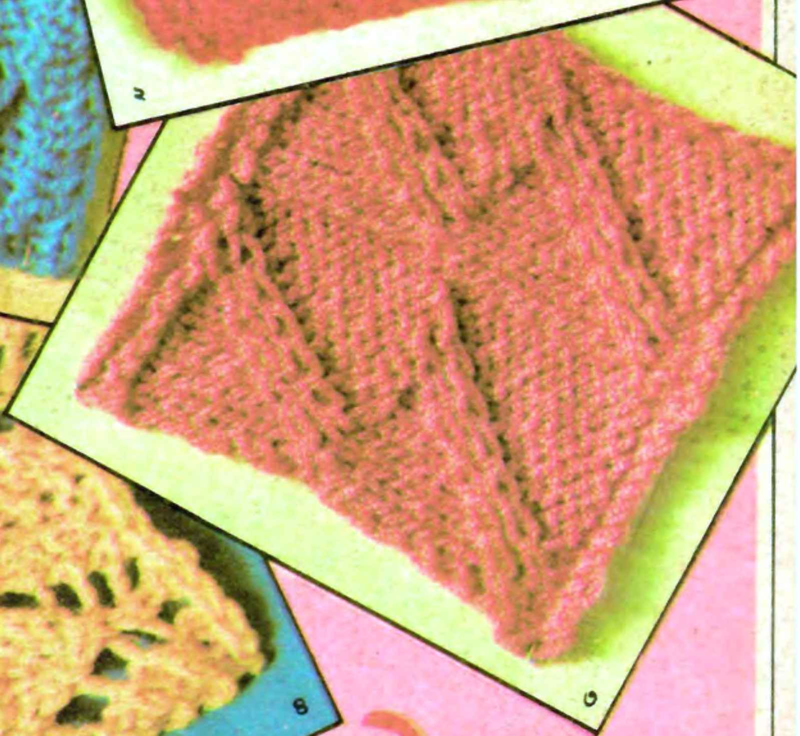

শীতের ফ্যাশন
মডেল : মৌসুমী সাহা
ফটো : শংকর নাগ দাস
বুটিক রাজমাতাজ-এর সৌজন্যে



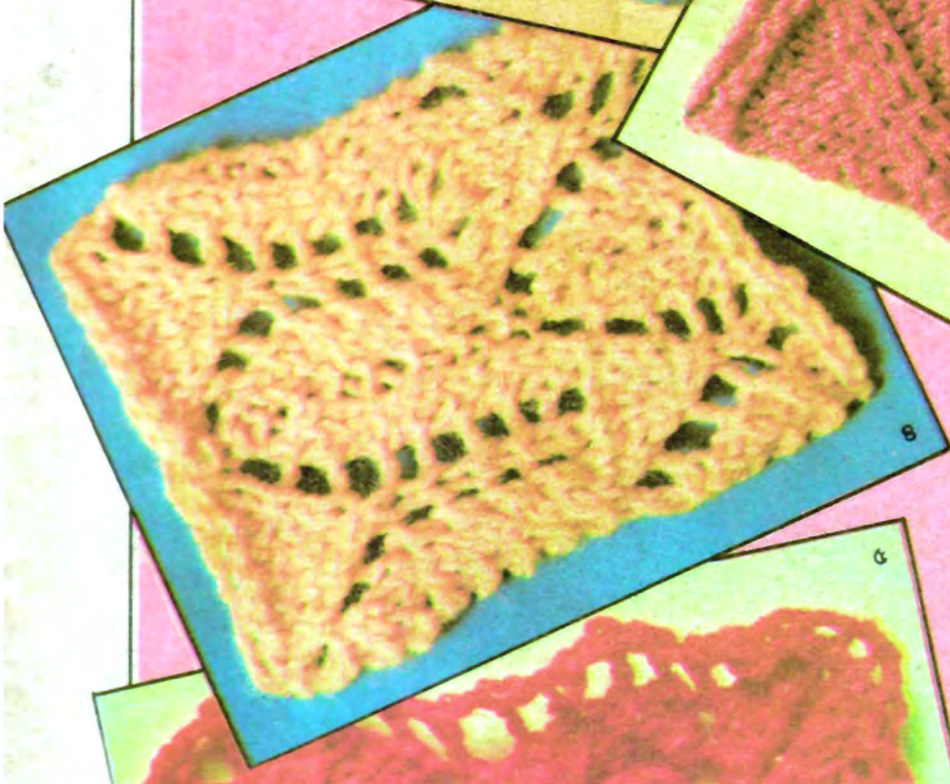
১



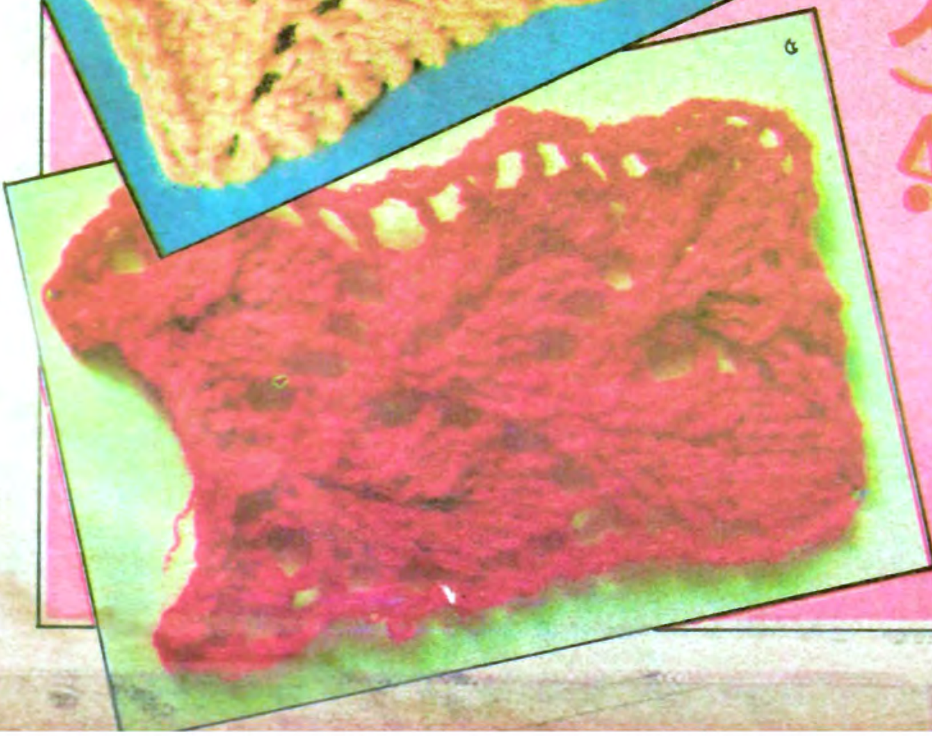
২



৩



৪



৫

উলের রকমারি নকশা

১ নং নকশা

১১ ঘরের ডিজাইন।

১ম সারি – * প্রথম ঘর ছেড়ে দ্বিতীয় ঘরটি বোনার সামনে দিয়ে সোজা বুনে পরে প্রথম ঘর সোজা বুনে ২ ঘর একসঙ্গে ফেলে দিন, পরের

প্রথম ঘর ছেড়ে দ্বিতীয় ঘর বোনার পেছনের দিক থেকে সোজা বুনে পরে প্রথম ঘর সোজা বুনে ২ ঘর একসংগে ফেলে দিন। * তারকা চিহ্নিত অংশের পুনরাবৃত্তি করুন। শেষে ৩ উল্টো, ১ সোজা, ৩ উল্টো। এইভাবে প্রথম সারি বুনুন।

২য় সারি – * প্রথম ঘর ছেড়ে দ্বিতীয় ঘর বোনার পেছনের দিক থেকে উল্টো বুনে পরে প্রথম ঘর উল্টো বুনে ২ ঘর একসঙ্গে ফেলে দিন। পরের প্রথম ঘর ছেড়ে দ্বিতীয় ঘর বোনার সামনে দিয়ে উল্টো বুনে তারপর প্রথম ঘর বোনার পেছনের দিক থেকে উল্টো বুনে ২ ঘর একসংগে ফেলে দিন * তারকা চিহ্নিত অংশের পুনরাবৃত্তি করুন।

৩য় সারি – ১ম সারির পুনরাবৃত্তি করুন।

৪র্থ সারি – ২য় সারির পুনরাবৃত্তি করুন।

৫ম সারি – ১ম সারির পুনরাবৃত্তি করুন।

৬ষ্ঠ সারি – ২য় সারির পুনরাবৃত্তি করুন।

৭ম সারি প্রথম ৪ ঘর ১ম সারির তারকাচিহ্নিত অংশের পুনরাবৃত্তি হবে। ৩ উল্টোর পর সোজার ৫ম সারির নিচে থেকে একটি করে ঘর তুলে কাঁটায় রেখে একটি করে ঘর উল্টো বুনুন। এইভাবে ৭টি অতিরিক্ত ঘর তোলা হবে ও ৭টি উল্টো বোনা হবে। এইভাবে পুরো সারি বুনুন।

৮ম সারি – প্রথম ৪ ঘরে ২য় সারির তারকাচিহ্নিত অংশের পুনরাবৃত্তি হবে, অতিরিক্ত ঘর কাঁটায় রেখে ৭ উল্টো হবে।

৯ম সারি – প্রথম চার ঘরে ১ম সারির তারকাচিহ্নিত অংশের পুনরাবৃত্তি করুন। পরের অতিরিক্ত ঘর একটি ও ১টি ঘর জোড়া করে উল্টো বুনুন। এইভাবে ৭ ঘর উল্টো বুনুন।

১০ম সারি – প্রথম ৪ ঘরে ১ম সারির প্রথম ৪ ঘরের পুনরাবৃত্তি হবে, ৩ সোজা, ১ উল্টো, ৩ সোজা।



২ নং নকশা

১৫ ঘরের ডিজাইন।

১ম সারি – ৪ সোজা, দ্বিতীয় ঘর বোনার পেছন দিক থেকে উল্টো বুনে প্রথম ঘর সোজা বুনে একসংগে ফেলতে হবে। ৩ উল্টো, দ্বিতীয় ঘর সামনের দিক থেকে সোজা বুনুন, প্রথম ঘর উল্টো হবে, ৪ সোজা।

২য় সারি – ৪ উল্টো, ১ সোজা, ১ উল্টো, ৩ সোজা, ১ উল্টো, ১ সোজা, ৪ উল্টো।

৩য় সারি – ৪ সোজা, ১ উল্টো, দ্বিতীয় ঘর বোনার পেছন দিক থেকে উল্টো বুনুন। প্রথম ঘর সোজা হবে। ১ উল্টো, দ্বিতীয় ঘর বোনার সামনের দিক থেকে সোজা বুনুন। প্রথম ঘর উল্টো হবে। ১ উল্টো, ৪ সোজা।



৪র্থ সারি – ৪ উল্টো, ২ সোজা, ১ উল্টো, ১ সোজা, ১ উল্টো, ২ সোজা, ৪ উল্টো।

৫ম সারি – ২ উল্টো, তৃতীয় ঘর বোনার সামনের দিক থেকে সোজা বুনুন। দ্বিতীয় ঘর উল্টো এবং প্রথম ঘর সোজা হবে, ২ উল্টো, ৪ সোজা।

৬ষ্ঠ সারি – ৪ উল্টো, ২ সোজা, ১ উল্টো, ১ সোজা, ১ উল্টো, ২ সোজা, ৪ উল্টো।

৭ম সারি ৪ সোজা, ১ উল্টো, দ্বিতীয় ঘরটি বোনার সামনের দিক থেকে সোজা এবং প্রথম ঘর উল্টো বুনুন, ১ উল্টো, দ্বিতীয় ঘর বোনার পেছনের দিক থেকে উল্টো বুনে প্রথম ঘর সোজা বুনুন, ১ উল্টো, ৪ সোজা।

৮ম সারি – ৪ উল্টো, ১ সোজা, ১ উল্টো, ৩ সোজা, ১ উল্টো, ১ সোজা, ৪ উল্টো।

৯ম সারি – ৪ উল্টো, পরের দ্বিতীয় ঘর বোনার সামনের দিক থেকে সোজা বুনুন, প্রথম ঘর উল্টো, ২ উল্টো, এর পরের দ্বিতীয় ঘর বোনার

পেছনের দিক থেকে উল্টো বুনে প্রথম ঘর সোজা বুনুন, ৪ উল্টো।

১০ম সারি – ৫ উল্টো, ৩ সোজা, ৫ উল্টো।

এইভাবে বোনার পর ডিজাইনটি আবার ১ম সারি থেকে শুরু হবে।

৩ নং নকশা

১১ ঘরের ডিজাইন

১ম সারি – ৬ উল্টো, * দুটি ঘর জোড়া সোজা বুনে দুই ঘরের মাঝখান থেকে কাঁটা বার করে দুটি ঘর তুলতে হবে, পরের ঘর দুটিকেও এইভাবে বোনা হবে। * তারকাচিহ্নিত অংশের পুনরাবৃত্তি করুন। শেষে ১ সোজা।

২য় সারি – ৫ উল্টো, ৬ সোজা।

৩য় সারি – ৫ উল্টো, এরপর প্রথম সারির তারকাচিহ্নিত অংশের পুনরাবৃত্তি করুন। শেষে হবে ২ উল্টো।

৪র্থ সারি – ৬ উল্টো, ৫ সোজা।

৫ম সারি – ৪ উল্টো, এরপর প্রথম সারির তারকাচিহ্নিত অংশের পুনরাবৃত্তি করুন। ৩ সোজা।

৬ষ্ঠ সারি – ৭ উল্টো, ৪ সোজা।

৭ম সারি – ৩ উল্টো, এরপর প্রথম সারির তারকাচিহ্নিত পুনরাবৃত্তি হবে; ৪ সোজা।

৮ম সারি – ৮ উল্টো, ৩ সোজা।

৯ম সারি – ২ উল্টো, এরপর প্রথম সারির তারকাচিহ্নিত অংশের পুনরাবৃত্তি হবে। ৫ সোজা।

১০ম সারি – ৯ উল্টো, ২ সোজা।

১১শ সারি – ১ উল্টো, এরপর প্রথম সারির তারকাচিহ্নিত অংশের পুনরাবৃত্তি হবে। ৬ সোজা।

১২শ সারি – ১০ উল্টো, ১ সোজা।

৬ নং নকশা

১৫ ঘরের ডিজাইন

১ম সারি – ২ উল্টো, পরের প্রথম ঘর ছেড়ে দ্বিতীয় ঘরটি বোনার সামনে দিয়ে সোজা বুনে দুটো একসংগে ফেলে দিন। পরের ৩ ঘর অতিরিক্ত কাঁটায় তুলে বোনার সামনে রাখুন। বাঁ হাতের কাঁটার ৩ ঘর সোজা বুনে তারপর তুলে রাখা ৩ ঘর সোজা বুনুন, সামনে সুতো এনে ২ ঘর একসংগে সোজা, ১ উল্টো, পরের প্রথম ঘর ছেড়ে দ্বিতীয় ঘর বোনার সামনে দিয়ে সোজা বুনে পরে প্রথম ঘর সোজা বুনে দু ঘর একসংগে ফেলে দিন, ২ উল্টো।

২য় সারি – সোজা ঘর সোজা, উল্টো ঘর উল্টো বুনুন।

৩য় সারি – ১ম সারির পুনরাবৃত্তি করুন।

৪র্থ সারি – ২য় সারির পুনরাবৃত্তি করুন।

এইভাবে পুরো ডিজাইন করতে হবে।

রানু দাস

৪ নং নকশা

৬ ঘরের গুণিতকে ঘর নিতে হবে, শেষে ৩ ঘর বেশি।

১ম কাঁটা – ৩ সোজা, * ৩ উল্টো, ৩ সোজা। *

২য় কাঁটা – ২ উল্টো, * ১ সোজা জোড়া, ১ সোজা, ১ ঘর না বুনে তুলে নিন, ১ সোজা, না-বোনা ঘর সোজা ঘর পার করে ফেলে দিন, ১ উল্টো, * শেষে ১ উল্টো।

৩য় কাঁটা – ২ সোজা * ৩ উল্টো, ২ সোজা * শেষে ১ সোজা।

৪র্থ কাঁটা – ১ উল্টো, ১ সোজা জোড়া, * ২টো ঘরের মধ্যের সুতো কাঁটায় তুলে ১ সোজা, বাঁ হাতের কাঁটার ঘরের ঠিক নিচের সারির ঘরের ভিতর দিয়ে ১ সোজা, সামনে সুতো ১ সোজা বুনে ফেলে দিন, পরের ঘরের মধ্যের সুতো কাঁটায় তুলে ১ সোজা, ১ ঘর না বুনে তুলে নিন, ১ জোড়া, না-বোনা ঘর জোড়া ঘর পার করে ফেলে দিন, * ১ ঘর না বুনে তুলে নিন, ১ সোজা না-বোনা ঘর সোজা ঘর পার করে ফেলে দিন, ১ উল্টো।

পুনরায় ১ম কাঁটা থেকে বুনুন।



৫ নং নকশা

৮ ঘর-এর গুণিতকে ঘর নিতে হবে, শেষে একটি ঘর বেশি।

১ম কাঁটা – * ১ উল্টো, ৭ সোজা। *

২য় ও প্রতি উল্টো কাঁটা – সব উল্টো।

৩য় কাঁটা – * ১ উল্টো, সামনে সুতো, ১ সোজা জোড়া, ৩ সোজা পেছনদিক থেকে, ১ সোজা জোড়া, কাঁটায় উল জড়িয়ে ১ ঘর তৈরি করুন। *

৫ম কাঁটা – ১ উল্টো, ১ সোজা, সামনে সুতো, ১ সোজা জোড়া, ১ সোজা পেছনদিক থেকে, ১ সোজা জোড়া, সামনে সুতো, ১ সোজা। *

৭ম কাঁটা – ১ উল্টো, ২ সোজা, কাঁটায় উল জড়িয়ে ১ ঘর তৈরি করুন, ১ ঘর তুলে নিন, ১ সোজা জোড়া, তোলা ঘর সোজা জোড়া পার করে ফেলে দিন, সামনে সুতো, ২ সোজা। *

৯ম, ১১শ, ১৩শ, ১৫শ, ও ১৭শ কাঁটা – * ১ উল্টো, ১ সোজা জোড়া, ১ সোজা পেছনদিক থেকে, সামনে সুতো ১ সোজা, সামনে সুতো ১ সোজা, ১ সোজা জোড়া। *

১৯শ কাঁটা – পুনরায় ৩য় কাঁটা থেকে আরম্ভ করুন।

ভারতী চক্রবর্তী

চকোলেট কেক





উপকরণ : ডিম – ৩টি, ময়দা – ১ কাপ ও ২ টেবিল-চামচ, সোডা – আধ চা-চামচ, নুন – আধ চা-চামচ, মিহি চিনি – ১ কাপ, তেল (সরষের তেল ছাড়া অন্য যে-কোনো) – সিকি কাপ, গরম জল – পৌনে এক কাপ, কোকো – ২ টেবিল চামচ, ভ্যানিলা এসেন্স – আধ চা চামচ।

প্রণালী : প্রথমে ওভেনটি ২৫০ ডিগ্রি ফারেনহাইট-এ গরম করে নিন। কেক-টিনের মধ্যে ভাল করে তেল বুলিয়ে নিয়ে সামান্য ময়দার গুঁড়ো ভাল করে ছড়িয়ে নিন (এতে গরম কেক পাত্রের গায়ে জড়ায় না)। এবার গরম জলে কোকো ভাল করে গুলে নিন, তারপর ঠাণ্ডা হতে দিন। ময়দা, নুন, চিনি, সোডা চালুনিতে ছেঁকে পরিষ্কার করে নিন। একটি পাত্রে ময়দা নিয়ে মাঝে একটি গর্ত তৈরি করুন। এবার কোকো মিশ্রিত জল, তেল, ঘোলানো ডিম, ভ্যানিলা পরপর ময়দার গর্তের মধ্যে ঢেলে দিন। একটা কাঠের চামচ দিয়ে সমস্ত মিশ্রণটিকে ফেটাতে থাকুন। চামচটি এমনভাবে ওপর থেকে নিচে, নিচে থেকে ওপরে নাড়াতে থাকুন যাতে ডিমের সাদা অংশ ভালভাবে মিশে যায়। বিপরীত ক্রমে চামচটি আড়াআড়িভাবে নাড়াতে থাকলে চকোলেট মিশ্রণটিও সুন্দরভাবে মিশে যাবে। এইভাবে মিশ্রণটিকে একটি মোলায়েম পেস্ট তৈরি

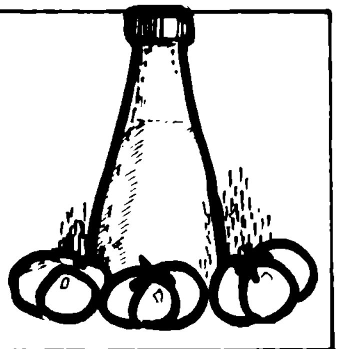
করুন। এবার মিশ্রণ কেক টিনে ঢেলে দিন। তারপর ওভেনে দিয়ে ৩৫ মিনিট বেক করুন। তৈরি কেক ওভেন থেকে বের করে নিন এবং ঠান্ডা হতে দিন। বিশেষ উপলক্ষ্যে উপহার দেওয়া, কিংবা অতিথি আপ্যায়নের জন্য কেকের ওপর চকোলেট, ক্রিম ইত্যাদির প্রলেপ তৈরি করা এবং বাদাম, নারিকেল, চেরি ইত্যাদির টুকরো দিয়ে, কেকটিকে সুন্দর সাজানো যেতে পারে। এরজন্য ১ টেবিল চামচ মাখন সামান্য আঁচে গলিয়ে নিন, এতে ১ টেবিল-চামচ কোকো মেশান। সামান্য একটু নাড়াচাড়া করে আঁচ থেকে নামিয়ে নিন। এক চিমটে নুন ফেলে দিন। ৩ টেবিল চামচ গরম জল এবং ৬/৭ টেবিল চামচ চিনি(Icing Sugar) মেশান। সব কিছু ভালভাবে মিলিয়ে চকোলেট পেস্ট তৈরি করুন। কেকের ওপর চকোলেটের আবরণ তৈরি করে চারধারের দেওয়ালে বাদামের টুকরো ঠেসে দিন। 'আইসিং'টিকে শুকনো হতে দিন।

কেকের ওপর ক্রিমের নকশা তৈরি করতে চাইলে, ১ টেবিল চামচ গুঁড়ো দুধ, ১ টেবিল চামচ জলে মেশান। এক চিমটে নুন এবং পরে আস্তে আস্তে ৩/৪ চামচ চিনি(Icing Sugar)দিয়ে সব কিছু ভালোভাবে নাড়তে থাকুন যতক্ষণ না 'আইসিং'-এর রঙ সাদা হয়।

এই 'আইসিং' দিয়ে কেকটির ওপর মনের মত নকশা তৈরি করে নিন।

শ্রীমতী আলিম

সসের মজা



আজকাল সসের ব্যবহার প্রায় বেশির ভাগ বাঙালির খাবার ঘরেই। তাই কয়েকটি সসের প্রস্তুত প্রণালী দেওয়া হল। এর মধ্যে কয়েকটি সস, ঘরে দীর্ঘদিন রেখে খাওয়া যাবে। আর কয়েকটি, সঙ্গে সঙ্গে খেয়ে নিতে হবে।

টম্যাটো সস

টম্যাটো – ৫ কেজি, পেঁয়াজ – ৬০ গ্রাম, আদা – ১০ গ্রাম, রসুন – ৫ গ্রাম, শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো – ১৫ গ্রাম, গরমমশলা – ১০ গ্রাম, জিরে – ৩ গ্রাম, গোলমরিচ ৩ গ্রাম, নুন – ৫০ গ্রাম, চিনি – ৩০ গ্রাম, ভিনিগার – ২০০ গ্রাম, সোডিয়াম বেঞ্জয়েট – ৪ গ্রাম (১ চা-চামচ)।

প্রস্তুত প্রণালী : প্রথমে টম্যাটোগুলো টুকরো টুকরো করে কেটে নিন। পেঁয়াজ কাটুন। রসুন, আদা মেশান এর সঙ্গে। এবার আঁচে চড়ান। যখন টম্যাটো গলে যাবে, তখন একটা তারের ছাঁকনিতে হাতা দিয়ে ঘষে ঘষে যতটা পারেন শাঁস (pulp) করে নিন। এবার একটা পাতলা কাপড়ে বাকি মশলা বেঁধে ওর মধ্যে ফেলে দিয়ে ফোটাতে থাকুন। চিনি মেশান ও সবশেষে ভিনিগার ও সোডিয়াম বেঞ্জয়েট। কাপড়টা চেপে রস বার করে নিয়ে এবার শাঁসটি গাঢ় করতে দিন। তাড়াতাড়ি ঘন করতে চাইলে একটা আপেল সেদ্ধ করে তার শাঁসটুকু মেশাতে পারেন। তৈরি হয়ে গেলে বোতলে ভরুন। একটা কাঠের ট্রের উপরে কাঁচের শিশি বসিয়ে গরম অবস্থায় পুরো ভর্তি করে তবে ঢাকা দেবেন। পরে ইচ্ছে হলে মোম দিয়ে সিল করতে পারেন। মনে রাখবেন আগে বোতল ফুটিয়ে জীবাণুমুক্ত করে নিতে হবে।

হট অ্যান্ড সুইট সস

এর প্রণালী প্রায় একই রকম। তবে এতে ৫ কেজি টম্যাটোর জায়গায় লাগবে ৪ কেজি এবং বাকিটা হবে কাঁচালঙ্কা বাটা ভিনিগার দিয়ে। আজকাল বাজারে 'ম্যাগি' এই ধরনের সস বার করেছে। কাঁচালঙ্কা বাটার অসুবিধে থাকলে লাললঙ্কা গুঁড়ো বেশি দিতে হবে।

মিকসড ভেজিটেবল সস

অসময়ে টম্যাটো পাওয়া না গেলে এটা বানানো যেতে পারে। এতে লাগবে গাজর – এক কেজি, বীট – ২০০ গ্রাম, আলু – ১ কেজি, পাকা তেঁতুল – ৫০০ গ্রাম, চিনি ও নুন পরিমাণ মতো। সোডিয়াম বেঞ্জয়েট – ৫ গ্রাম, ভিনিগার – ২০০ গ্রাম।

প্রস্তুত প্রণালী : সব সেদ্ধ করে ছাঁকনিতে ছেঁকে নিতে হবে। তেঁতুল আগে দেবেন না। পরে তরকারি সেদ্ধ জলে গুলে তারপর ছেঁকে স্বাদ অনুপাতে মিশিয়ে নেবেন। এরপর নুন, মিষ্টি, ভিনিগার ও সোডিয়াম বেঞ্জয়েট দিয়ে ফুটিয়ে তবে নামাবেন।

চিলি সস

কাঁচালঙ্কা – ১ কেজি, নুন – ১০০ গ্রাম, আলু – ৩০০ গ্রাম, ভিনিগার – ৪০ গ্রাম, সোডিয়াম বেঞ্জয়েট – ১ চা-চামচ, জল – আড়াই লিটার, গরমমশলা গুঁড়ো অল্প।

প্রস্তুত প্রণালী : প্রথমে কাঁচালঙ্কা ভিনিগার দিয়ে বেটে নিতে হবে। আলু খুব ভালভাবে প্রেসারে সেদ্ধ করে খোসা ছাড়িয়ে মেখে নিতে হবে। এবার জলের মধ্যে সব মিশিয়ে ঘনঘন হয়ে এলে, বাকি মশলা মিশিয়ে নামিয়ে নিতে হবে।

চিলি সস (২)

যাঁরা ঝাল পছন্দ করেন না অথবা সহ্য করতে পারেন না তাঁদের জন্য এই চিলি সস। এতে কাঁচালঙ্কার জায়গায় নেবেন ক্যাপসিকাম – ৫০ গ্রাম, কাঁচা টম্যাটো – ১০০ গ্রাম, ভিনিগার – ৩০০ গ্রাম, সোডিয়াম বেঞ্জয়েট – ৩ গ্রাম, অল্প জল, নুন ও চিনি আন্দাজ মতো, পেঁয়াজ ও রসুন – ৫ গ্রাম।

প্রস্তুত প্রণালী : কাঁচা টম্যাটো সেদ্ধ করে ছেঁকে নিতে হবে একটু বড় মোটা চালুনি দিয়ে, যাতে খোসাটা না যায় অথচ বিচি কিছুটা যেতে পারে। ক্যাপসিকাম বেটে নিতে হবে। তারপর ভিনিগার, নুন, চিনি, জল দিয়ে সেদ্ধ বসাতে হবে। ঘন হয়ে এলে সোডিয়াম বেঞ্জয়েট দিয়ে ফুটিয়ে বোতলে ভরে রাখুন।

চিলি সস (৩)

এতে প্রথমোক্ত নিয়মে কাঁচালঙ্কা বেটে নিতে হবে। তবে আলু দিতে হবে না বা জলও দিতে হবে না। কাঁচালঙ্কা বাটা ভিনিগারে

দিয়ে পরে অল্প পোস্ত ভিনিগারে বেটে মিশিয়ে নিতে পারেন।

এই সসগুলি তৈরি করে ঘরে রাখা যেতে পারে। এবার যেসব সসের প্রস্তুতপ্রণালী জানানো হচ্ছে, সেগুলি সংগে সংগে বা বড়জোর কয়েকদিন রেখে খাওয়া চলতে পারে। বেশিদিন রাখা যাবে না।

ক্র্যাব সস : এটি চীনে সস। খেতে গেলে খেতে হবে মাছের কোনো প্রিপারেসনের সংগে।

প্রস্তুত প্রণালী : যাঁরা কাঁকড়া ভালবাসেন এটি কেবল তাঁদের জন্য। একদম জ্যান্ত ছোট সাইজের কাঁকড়া বেছে পরিষ্কার করে ১ চামচ তেলে অল্প ভেজে দুধ ঢেলে দিন। এরপর এতে কর্নফ্লাওয়ার ও নুন মিশিয়ে সেদ্ধ হতে দিন। ভাল সেদ্ধ হয়ে থকথকে হলে মাছ ভাজার সংগে খাওয়া চলতে পারে। জানি না বাঙালি রসনায় এটি কতদূর সমাদৃত হবে। মনে রাখতে হবে কাঁকড়া কাটার সংগে সংগে রাঁধতে হবে। মরা কাঁকড়া খেলে বিষক্রিয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

চিংড়ির সস : ছোট ছোট চিংড়িমাছ দিয়ে এই একই প্রথায় সসটি করা হয়।

সুইস অ্যান্ড সাওয়ার সস : বাদাম তেল – ১ চা-চামচ, জল – ২ চা-চামচ, ভিনিগার – ২ চা-চামচ, চিনি – ১ চা-চামচ, নুন অল্প, আনারস ছোট ছোট টুকরো করে কাটা, কর্নফ্লাওয়ার – ১ চা-চামচ, ঠান্ডা জল – ২ চা-চামচ।

প্রস্তুত প্রণালী : প্রথমে তেল গরম করুন। এবার তাতে জল, ভিনিগার, নুন ও চিনি দিন। যেই ফুটে উঠবে অমনি আনারসের টুকরো, কর্নফ্লাওয়ার (অল্প ঠান্ডা জলে গুলে) তার সংগে মেশান। ঠান্ডা হলে নামান। দরকার হলে অল্প চিংড়ি মাছও দিতে পারেন এতে।

জিঞ্জার সস : বাদাম তেল – ২ চা-চামচ, আদা বাটা – ১ চা-চামচ, পেঁয়াজ খুব পাতলা করে কাটা, সামান্য নুন।

প্রস্তুত প্রণালী : প্রথমে নুন, তেল ও আদাবাটা দিয়ে একটা পেস্টের মতো তৈরি করুন। শেষে পেঁয়াজ দেবেন।

মাস্টার্ড সস : অল্প মাখন, ময়দা ২ চা-চামচ, সর্ষে বাটা – ২ চা-চামচ, চিনি ও নুন আন্দাজ মতো, অল্প লেবুর রস, ক্রিম আধ কাপ দিলে ভাল হয়।

প্রস্তুত প্রণালী : সবকিছু মিশিয়ে অল্প আঁচে নাড়তে থাকুন, থকথকে হলে যেন আটকে না যায়। নামিয়ে ঠান্ডা হলে পরিবেশন করুন। □

প্রমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়



দত্ত জেঠিমার পিঠে-পায়েস

বারো বছর বয়সে এক গাঁ থেকে আর এক গাঁ পাথরবেড়িয়ায় ছোট্ট বধূ হয়ে এসেছিল সুন্দরী রাধা। বাপহারা ছোট্ট কিশোরী পুতুল খেলা ছেড়ে অবুঝ কান্নাকে সংগী করে ঠাকুমাকে সংগে নিয়েই প্রখ্যাত বনেদী দত্তবাড়ির সেজ বউ হয়ে এল। সেই আসা। তারপর কেটে গেছে প্রায় চল্লিশ বছর। এখনও দুর্গা প্রতিমার মত রূপ। রান্না বান্না ঘরকন্না সবই শিখেছেন ঠাকুমা আর পাড়া প্রতিবেশীর কাছ থেকে। যাঁকে দেখলেই শ্রদ্ধায় ভালবাসায় মাথা নত হয়ে আসে সেই দত্ত জেঠিমাকেই আবদার করলাম, আপনার পিঠে পায়েসের কথা বলুন। যত রকম শিখেছেন সব কিছু!...

হেসেই পাগল জেঠিমা। মেয়ে বউ সবাই বলে উঠল 'সেজে গুজে বস গো তোমার ফটোক উঠবে।' কপট ধমক দিয়ে জেঠিমা বলে উঠলেন 'তোরা চুপ কর। কাজের কথা হোক। তুমি লেখ অঘ্রাণ সংক্রান্তি থেকে। এই দিন আমরা গাঁয়ের সব ঘরের মেয়ে বউ গিন্নিরা চালের গুঁড়ি হাত করে পিঠে-পায়েস দিয়ে শীতের খাওয়া শুরু করি। শেষ হয় পৌষের সংক্রান্তি ও আক্ষিণের দিনে। ছড়া কেটে বলি পিঠে করার প্রথম দিনেই – এ সংক্রান্তিতে গুঁড়ি হাত/পরের সংক্রান্তি পিঠে ভাত।' আর পৌষের শেষ তিনদিনের উদ্দেশ্যে বলে থাকি 'আওনি-বাওনি নেওনি এই তিনদিন যেন না কোথাও যেও, ঘরে বসে পিঠে ভাত খেও।'

(১) অঘ্রাণ সংক্রান্তির দিনে হয় সেদ্ধ পুলি আর পিঠে পায়েস

নিয়ম : নতুন চালের (আতপ হলে ভাল) গুঁড়ি করতে হবে। ঢেঁকি অথবা শিলে (চাল ভিজিয়ে জল ঝরিয়ে গুঁড়ি করতে হবে) আজকাল মেশিনেও হচ্ছে (তবে এতে পিঠে ভাল হয় না)। চালের গুঁড়ি আটা চালুনি দিয়ে চেলে নিতে হবে (খুব মিহি হলে চালার প্রয়োজন হয় না)। এবারে উনুনে কড়া চাপিয়ে এই গুঁড়ি একটু গরম করে নেড়ে নিতে হবে। গরম করা গুঁড়ি ফুটন্ত গরম জল দিয়ে একটু হাত সইয়ে, পরিমাণ মত নুন দিয়ে বেশ ঠেসে ঠেসে ভাল করে মাখতে হবে মাখা হয়ে গেলে লুচির মত লেচি কেটে নিন, দুটো আঙুল দিয়ে ওই লেচি ধার থেকে টিপে টিপে খোল তৈরি করুন এই খোল ধীরে সুস্থে একটা একটা করে করতে হয়। কাজেই গুঁড়ি মাখার পরিমাণ যদি বেশি হয় তবে ওই মাখা গোলা একটা ভিজে কাপড় দিয়ে জড়িয়ে রাখতে পারেন। এভাবে রাখলে তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যাবে না। পুলির খোল তৈরি করার আগে অবশ্যই পুর তৈরি করে রাখতে হবে। কারণ এক একটি খোল তৈরির সংগে সংগেই পুর ভরে মুখটা বন্ধ করে দিতে হবে সিংগাড়ার মত মুখ করে। এবার কীভাবে পুর তৈরি করবেন যদি মিষ্টি পুলি খেতে চান তবে নারকেল কুরে মিহি করে বেটে, চিনি বা গুড় দিয়ে উনুনে অল্প আঁচে কড়া বসিয়ে ভাল করে নেড়ে নিন। যখন দেখবেন নারকেল কড়ার গা থেকে আলগা হয়ে আসছে,

বুঝবেন পাক হয়ে গেছে। এবারে ঐ পাক দেওয়া নারকেল পুর নাড়ুর মত গোল গোল করে ওই পুলির খোলের মধ্যে দিন (খোল ভর্তি করে পুর দেবেন) খোল ছোট করবেন কি বড় করবেন তা নির্ভর করছে যিনি গড়বেন তাঁর উপরে। তবে ছোট ছোট পুলি হলে দেখতে ও খেতে দুই-ই ভাল হয়।

এতো গেল মিষ্টি পুর। এবার ঝাল পুর করতে চাইলে, ফুলকপি ও আলু ছোট্ট ছোট্ট করে কেটে শুকনো তরকারি বানিয়ে রাখুন। এইভাবে বাঁধাকপি ও আলুর শুকনো তরকারি করে রাখতে পারেন। যদি ডালের পুর করতে চান, তবে যে কোন ডাল দিয়ে (মুসুরি ও বিউলি ডাল ছাড়া) করতে পারেন। ডাল ভাল করে সেদ্ধ করে নিন। শুকনো লংকা জিরে ভেজে গুঁড়িয়ে অল্প মিষ্টি ও পরিমাণ মত নুন দিয়ে ডালটাকে শুকনো শুকনো করে পাকিয়ে নিন। ভাজা মশলা দিলে গন্ধটা সুন্দর হয়। পোস্ত বেটেও পুর করতে পারেন। পোস্ত ভাল করে ধুয়ে নুন দিয়ে মিহি করে বেটে নিন। এবারে উনুনে কড়া চাপিয়ে অল্প তেল, অল্প মিষ্টি, সামান্য লংকা বাটা দিয়ে নেড়ে চেড়ে পুর তৈরি করুন। পুর তৈরি শেষ হলে যে কোনো একটা পুর দিয়ে পুলি গড়ুন। বিভিন্ন পুরে পুলির বিভিন্ন স্বাদ।এবার পুলি সেদ্ধ করার কথা বলি। কারণ এতক্ষণ যা হল তাতে কিন্তু পুলি এখনো কাঁচাই রয়ে গিয়েছে। উনুনে ছোট্ট কড়া বা অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়িতে (হাঁড়ি হলেই ভাল) টগবগ করে জল ফুটতে দিন। ধোঁয়া ওঠা শুরু হলে ঝাঁজরি মালসার মধ্যে পুর দেওয়া পুলিগুলো দিয়ে হাঁড়ির মুখে ঢাকনার মত করে বসিয়ে দিন। এবার মালসার ওপর একটা থালা দিয়ে চাপা দিন। ১০-১৫ মিনিট পরে নামিয়ে নিন। থালায় ছড়িয়ে অল্প জলছড়া দিয়ে ঠান্ডা করতে দিন। (জল ছড়া দেবার কারণ পিঠেগুলো ভাপানোর সময়ে একে অপরের গায়ে জড়িয়ে থাকে হাত দিয়ে ছাড়ালে ভেঙে যেতে পারে) এই সেদ্ধ পুলি শুধু খাওয়া যায় আবার নতুন গুড় দিয়েও খাওয়া যায়। এছাড়া নারকেল পুর বা ক্ষীরের পুর দিয়ে পুলি করে দুধে ফেলে দুধ পুলি ও পায়েসে ফেলে পায়েস পুলি করতে পারেন। দুধ পুলি করতে হলে যখন টগবগ করে দুধ ফুটবে তার মধ্যে পরিমাণ মত চিনি দিয়ে তৈরি পুলি ছেড়ে দিন। আরও ১০ মিনিট ফুটিয়ে নামানোর আগে ছোট এলাচ গুঁড়ো করে ছড়িয়ে দিন। দুধ খুব ঘন হলেই নামাবেন।

পায়েস পিঠে : দুধ ফুটে উঠলে চাল দিয়ে চাল সেদ্ধ করে নিন। কিশমিশ, কাজু, পেস্তা দিয়ে ছোট ছোট পুর পুলি ছেড়ে দিন। নামানোর আগে ছোট এলাচের গুঁড়ো দিন। যাঁরা পছন্দ করেন তাঁরা কর্পূরও গুঁড়ো করে দিতে পারেন। ঠান্ডা হলে পরিবেশন করুন।



সরু চাকলি : বিউলি ডাল বা কলাইয়ের ডাল আগের দিন রাত্রে ভিজিয়ে রাখুন। ১ কিলো চালের সংগে ২৫০ গ্রাম বিউলি ডাল লাগে। চাল, ডাল ও আধমালা নারকেল কুরে এক সংগে শিলে বেটে নিন। থকথকে এই চাল-ডালবাটা কাঁচা জলে ফেটাতে হবে। সংগে দেবেন কাঁচালংকা-আদা-মৌরী বাটা ও পরিমাণ মত নুন। বেসনের মত করে ফেটানো হয়ে গেলে সরু চাকলি বানান। অল্প আঁচে চাটুতে অল্প তেল বুলিয়ে নিন। (তেল বুলনোর জন্য ব্যবহার করতে পারেন কলাপাতার ডাঁটা, বেগুনের বোঁটা, কাপড়ের পুঁটুলি। সরু চাকলি তোলার জন্য একটা চামচ বানান। তালপাতা অথবা দেশলাইয়ের খোল দিয়ে একটা ফ্ল্যাট চামচে তৈরি করতে হবে। এই চামচের চারটে কোণ কাঁচি দিয়ে সুন্দর করে কেটে নিন। চামচ হয়ে গেল এবারে এবারে চাটুতে তেল বুলিয়ে এক হাতা বা এক ডাব্বু গোলা ঢেলে দিন। গোলাটা রুটির মত ছড়িয়ে দিন। বানানো চামচ দিয়ে। এরপর মিনিট খানেক পরেই দেখবেন ঐ গোলা ফুট ফুট হয়ে ছোট ছোট ফুটো হয়েছে এবং ধোঁয়া উঠছে, বুঝবেন হয়ে গেছে। বানানো চামচ দিয়ে সরু চাকলি উল্টে ফেলুন রুটির মত করে, এপিঠ ওপিঠ ভেজে থালায় ছড়িয়ে রাখুন। একটু ঠান্ডা হলে পরোটার মত বা রুমালের মত চার ভাঁজ করে রেখে দিন। এই সরু চাকলি ঝাল ঝাল তরকারি বা নতুন গুড় দিয়ে খেতে পারেন।

ভাজাপিঠে : সেদ্ধ চাল অথবা আতপ চাল ভিজিয়ে জল ঝরিয়ে, শিলে মিহি করে বেটে গুঁড়ি তৈরি করে নিন। গুঁড়ি সামান্য নুন দিয়ে অল্প গরমজলে আটার মত মাখুন নরম করে। এবারে আখের গুড় দিয়ে ওই মাখা গুঁড়িকে আবার ভাল করে মাখুন। একটুও জল দেবেন না। গুড়ের রসেই ওটা পাতলা হয়ে যাবে। এবারে ছাঁকা তেলে ঐ গোলা এক হাতা করে দিয়ে ভাজুন। দেখবেন, আলুর চপের মত ফুলে উঠছে। গরম-ঠান্ডা যেমন করেই খান, দারুণ সুস্বাদু। এক কিলো চালের গুঁড়িতে ২৫০ গ্রাম আখের গুড় লাগে। ভাজার জন্য ২৫০-৩০০ গ্রাম সরষের তেল লাগে। এই ভাজা পিঠে দু তিনদিন ধরে রেখে খাওয়া যায়।

আসকে পিঠে : তিন ভাগ চালের গুঁড়ির সংগে এক ভাগ বিউলি ডাল ভিজিয়ে জল ঝরিয়ে নিন, বাটা ডাল তিন ভাগ চালের গুঁড়ি ও একমালা নারকেল কোরা একসংগে করে অল্প হাত সওয়া গরম জলে পরিমাণ মতো নুন দিয়ে সিন্নির মত করে মেখে নিয়ে গোলা তৈরি করুন। (কুমোরের দোকান থেকে পিঠে করার মত সরা কিনে রাখবেন) অল্প আঁচে সরা বসিয়ে দিন। অল্প তেল বুলিয়ে নিয়ে এক হাতা করে ঢেলে দিন। ওই সরার সংগে যে ঢাকনা থাকে সেই ঢাকনা এবারে চাপা দিন। চাপা ঢাকনার চার পাশটা ভিজে কাপড় দিয়ে গোল করে জড়িয়ে দিন। দু মিনিট পর ঢাকা খুলে খুন্তি দিয়ে পিঠে তুলে নিন। এই পিঠে করতে বেশ সময় লাগে। এই পিঠে নতুন গুড় দিয়ে খেতে হয়।

রাঙা আলুর পান্তুয়া : রাঙা আলু ভাল করে সেদ্ধ করে নিন। অল্প ময়দা দিয়ে সেদ্ধ আলু চটকে ভাল করে নরম করে মাখুন। জল দেবেন না। এবারে পান্তুয়ার সাইজে গোল গোল করে বানিয়ে নিন, মাঝখানে দিন একটা করে এলাচ দানা অথবা ক্ষীরের ছোট গুলি। এবারে ডালডা বা ছাঁকা তেলে ওই গোলা গুলো লাল করে ভেজে নিন। চিনির রস জ্বাল দিয়ে তৈরি করে আগেই রাখবেন। বেশ কয়েকটা করে একসাথে ভেজে নিয়েই রসে ডুবিয়ে দিন। ঠান্ডা হলেই খেয়ে নিন। এই জিনিস রেখে খাওয়া যায় না।

মুগসামলি পিঠে : ভাজা মুগের ডাল ভাল করে সেদ্ধ করে নিন। তবে ডাল যেন ভেঙে গলে না যায়। চালের গুঁড়ি গরম কড়ায় অল্প নেড়ে নিন। এবার জল ছাড়াই সেদ্ধ ডাল ও চালের গুঁড়ি একসঙ্গে ভাল করে আটা মাখার মত করে মাখুন। মাখাটা নরম হবে। এবারে নারকেলের পুর তৈরি করে রাখুন মিষ্টি দিয়ে। মাখা চালের গুঁড়ি থেকে লেচি কাটুন। পুলির মত খোল তৈরি করে পুর দিয়ে মুখ বন্ধ করে দিন। এবারে ছাঁকা তেলে বা ভাল ঘিয়ে ওই পুলি মুচমুচে করে ভাজুন। তেলেভাজা খাবার মত মজা করে খান। এই পিঠে ঠান্ডা ও গরম দুই-ই খেতে ভাল লাগে।

রসবড়া : বিউলির ডাল আগের দিন রাত্রে ভিজিয়ে দিন। পরের দিন শিলে মিহি করে বেটে ফেটিয়ে নিন। ডাল ফেটানো হয়েছে কিনা বোঝার জন্য জলে ফেলে দেখে নিন। যদি ভেসে থাকে তাহলে বুঝবেন ডাল ফেটানো হয়েছে। এইবার ফেটানো ডালবাটা দিয়ে বড়ির মত সাইজের করে ছাঁকা তেলে বা ভাল ঘিয়ে ভাজুন। চিনির রস জ্বাল দিয়ে আগেই তৈরি করে রাখবেন। ১০-১২টা গুলি একসঙ্গে করে ভেজে রসে ডুবিয়ে দিন। বেশ কিছুক্ষণ রসে ভিজে গেলে ঠান্ডা করে পরিবেশন করুন।

চিঁড়ের পিঠে : চিঁড়ে ভিজিয়ে চিনি নারকেল কোরা ও অল্প ময়দা দিয়ে ভাল করে আটা মাখার মত মেখে নিন। একটা বড় থালায় মাখা চিঁড়ে চেপে চেপে থালায় ছড়িয়ে দিন। বেশ পুরু করে দেবেন। এবারে একটি ছুরি দিয়ে সন্দেশের মত পিস করে কাটুন। টুকরোগুলো ভাল করে ঘিয়ে ভেজে নিয়ে মুচমুচে খাবার বানান। গরম গরম পরিবেশন করুন।

কলার বড়া বা কলাপিঠে : চালের গুঁড়ি, পাকা কলা, নারকেল কোরা, চিনি বা গুড় দিয়ে ভাল করে মাখুন। জল একটুও দেবেন না। কলার রসে ও নারকেল দুধেই মাখা হয়ে যাবে। আটা মাখার মত হয়ে গেলে বড়ার আকারে ভাজুন ভাল ঘিয়ে বা ছাঁকা তেলে। গরম গরম খান তেলেভাজার মত স্বাদে।

পাটিসাপটা : চালের গুঁড়ি বা ময়দা দিয়ে করতে পারেন। চালের গুঁড়ি বা ময়দা, দুধ, অল্প গরম জল, অল্প মিষ্টি, অল্প নুন ও মৌরি দিয়ে মেখে ভাল করে গোলা তৈরি করুন। নারকেলের পুর বা ক্ষীরের পুর তৈরি করে আগেই রাখুন। এবারে অল্প আঁচে চাটুতে ঘি লাগিয়ে এক হাতা করে গোলা ছড়িয়ে দিন। মাঝখানে লম্বা করে পুর দিন (ক্ষীর বা নারকেলের)। ওমলেটের মত ভাঁজ করে আবার ঘি ছড়িয়ে এপিঠ ওপিঠ করে ভাজুন। ভাজা পিঠেও এমনি খেতে পারে। আবার যদি ইচ্ছে করেন তবে এই পিঠেগুলোই চিনির রসে ডুবিয়ে বা দুধ ঘন করে জ্বাল দিয়ে খেতে পারেন। স্বাদ অপূর্ব।

স্মৃতি হাতড়ে রান্না বলা শেষ করে একটু হাঁফ ছাড়লেন দত্ত জেঠিমা। আমি তখনো খাতা-কলম বাগিয়ে বসে আছি। যদি আরও কিছু বাগানো যায়। জেঠিমা সেটা আঁচ করতে পেরে বললেন, 'আমরা গাঁয়ের মানুষরা এই ক'রকম ছাড়া আর পিঠে করি না। জানি না বাপু তোমাদের শহুরে মানুষদের কেমন লাগবে!' □

চন্দ্রা মিত্র

শুটিং চলছে

মাইথনের শীতে অগ্নিকন্যা



টালিগঞ্জের স্টুডিও-ফ্লোরে ও বিভিন্ন আউটডোর লোকেশনে জি পি ফিল্মস-এর রঙিন বাংলা ছবি 'অগ্নিকন্যা'-র শুটিং দ্রুত এগিয়ে চলেছে। ছবির নায়ক ফারুক শেখ, নায়িকা রূপা গাঙ্গুলি। পরিচালক গোপাল গুপ্তা। এর আগে 'দূর দূর পাশ পাশ' নামে একটি হিন্দি ছবি পরিচালনা করেছিলেন গোপালবাবু। ছবির প্রযোজক প্রখ্যাত শিল্পপতি গোপাল পোদ্দার। 'অগ্নিকন্যা' তাঁর প্রযোজিত প্রথম ছবি।

সম্প্রতি মাইথনে 'অগ্নিকন্যা'-র আউটডোর শুটিং হয়ে গেল। এবার শীতটা এখানে একটু আগে থেকেই জাঁকিয়ে পড়েছে। তবে রাতের দিকেই। দিনের বেলায় কিন্তু সেই চড়চড়ে রোদ্দুরই। পশ্চিমবঙ্গের সীমানা ঘেঁষা বিহারের এই জায়গাটি নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক দৃশ্যের জন্য যথেষ্টই সুপরিচিত। দামাল বরাকর নদীকে কারিগরি কুশলতায় বরাবরের মত সামাল দিয়ে ডি ভি সি কর্তৃপক্ষ বহু বছর আগে গড়ে তুলেছিল মাইথন ড্যাম। এই ড্যামের ওপরেই মানুষ ও যান চলাচলের জন্য ঘোরানো-ফেরানো মসৃণ পিচের রাস্তা। এই রাস্তাতেই টেক্ করা হল গৌতম (ফারুক) এবং মমতার (রূপা) নিবিড় প্রেমের বেশ কিছু দৃশ্য। দুজনেই দারুণ স্বচ্ছন্দে অভিনয় করলেন। যেহেতু 'অগ্নিকন্যা'-র কাহিনীর সংগে বরাকর-আসানসোল এলাকার যোগসূত্র রয়েছে তাই শুধু আউটডোরই নয় কিছু কিছু ইনডোর শুটিংয়ের কাজও এখানে সেরে নিলেন পরিচালক।

বরাকরে কয়েক বিঘা জমির ওপর কে ডি শরাফের বিশাল বাংলোতে একপ্রস্থ ইনডোর শুটিং হল। ফারুক এবং রূপা এই বাংলোতেই উঠেছিলেন। ছিলেন অনিল চ্যাটার্জিও। শুটিংয়ের অবসরে বাংলোর গালিচা-সবুজ লনে আড্ডা মারলেন ফারুক, রূপা এবং অনিল



চ্যাটার্জি। স্টুডিওপাড়ার সদা হাস্যময় এই মানুষটির প্রিয় বিষয় আড্ডা। দারুণ গল্প বলে আসর মাতাতে ওস্তাদ তিনি। মাইথনেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। বেশ কয়েকটা দিন শুধু ফারুক বা রূপাই নন, গোটা ইউনিটের লোকজনকে হাসিয়ে মাতিয়ে রেখেছিলেন অনিল চ্যাটার্জি।

'অগ্নিকন্যা'-র কাহিনী শুধু গৌতম এবং মমতার প্রেমকে উপজীব্য করেই গড়ে ওঠেনি। তাদের বিয়ে যেমন হয়েছে, হয়েছে পরস্পরের মধ্যে অসম্ভব রকমের ভুল বোঝাবুঝি। তাদের একমাত্র ছেলে রাহুলকে নিয়ে সুখের সংসার গড়ে উঠতে উঠতেই ভেঙে



'অগ্নিকন্যা'-র একটি দৃশ্যে ফারুক শেখ ও রূপা গাঙ্গুলি

পড়ল। নানা ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দারুণরকম মানসিক টানাপোড়েন চলতে লাগল। হঠাৎ একদিন গৌতমের অসুস্থ বাবা মারা গেলেন। মমতা তার শ্বশুরকে খুব শ্রদ্ধা করত। মমতা সন্দেহ করল এই মৃত্যুর পেছনে তার স্বামীর কোনো হাত রয়েছে। মমতার দেওয়া এজাহারের ভিত্তিতে খুনের দায়ে পুলিশ গৌতমকে গ্রেপ্তার করল। বিচারে তার ফাঁসির হুকুম হল। কিন্তু

পরিচালক গোপাল গুপ্তা 'অগ্নিকন্যা' ছবির একটি দৃশ্য বুঝিয়ে দিচ্ছেন ফারুক শেখ ও রূপা গাঙ্গুলিকে। সঙ্গে প্রযোজক গোপাল পোদ্দার



ছেলে হয়ে নিজের বাবার মৃত্যুর জন্য কি সত্যিই দায়ী হতে পারে গৌতম এ ধরনের একের পর এক ঘাত-প্রতিঘাত ও অগুন্তি প্রশ্ন গোটা ছবি জুড়েই। আর সেই সঙ্গে শিল্পীদের টান টান অভিনয়ও 'অগ্নিকন্যা'কে আলাদা ধরনের মাত্রা এনে দিতে পারবে।

এই ছবির অন্য শিল্পীরা হলেন অনিল চ্যাটার্জি, উৎপল দত্ত, কল্যাণ চ্যাটার্জি, চিনু পাল, অরিন্দম শীল, রবিশংকর, শিশুশিল্পী মণিময় পাইক প্রমুখ। ছবির গল্প ও চিত্রনাট্য লিখেছেন পরিচালক। সহ-পরিচালক মুন্না রিজভি। ইউনিট কন্ট্রোলার বজরংগ সিকারিয়া, ক্যামেরাম্যান পূর্ণেন্দুবিকাশ চৌধুরি। শিল্প নির্দেশক বুদ্ধদেব ঘোষ, সম্পাদনায় বিভূতিভূষণ। দিলীপ ব্যানার্জির সংগীত পরিচালনায় গান গাইছেন শিখা ব্যানার্জি এবং সৈকত মিত্র। 'অগ্নিকন্যা' ছবির প্রচারের দায়িত্বে রয়েছেন নীতা সরকার। □

সুমন গুপ্ত

ফটো : অর্ধেন্দু রায়

প্রেমের জোয়ারে

জন্মশতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি

টি এস এলিয়ট

এ বছর এলিয়টের জন্মশতবর্ষ। তাঁর জন্ম আমেরিকার মিসৌরির সেন্ট লুইসে। জন্মসূত্রে আমেরিকান হলেও এলিয়ট পরবর্তী জীবনে ইংলন্ডের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। ইংরাজি কবিতায় তিনি আধুনিক মনন ও অনুষঙ্গ সৃষ্টি করেন। বিবিক্ত নাগরিকতা ও নৈর্ব্যক্তিকতা তাঁর কবিতা, নাটকে চেতনা করোজ্জ্বল হয়ে আছে। প্রবন্ধ সাহিত্যেও তিনি অনন্য। প্রথম জীবনে ভিভিয়েন হেই উডের প্রণয় ও পরিণয় পরিণামে সুখের হয়নি এলিয়টের জীবনে। বেশ কিছু নারীর সান্নিধ্য ও সাহচর্য তাঁকে উদ্দীপিত করেছিল, তাঁরা হলেন ওটোলিন মোরেল, এডিথ স্টিওয়েল, ভার্জিনিয়া উলফ, এমিলি হেল। শিক্ষকতা থেকে ব্যাঙ্কের চাকরি এবং প্রকাশন সংস্থার কাজও করেছেন এলিয়ট। এই প্রকাশনার সহকারিণী ভ্যালেরির সঙ্গে বয়সে পার্থক্য সত্ত্বেও এলিয়টের জীবন জড়িয়ে যায়। ভ্যালেরিকে বিয়ে করে এলিয়টের জীবন অপরাহ্ন আসঙ্গে ভরে উঠেছিল।



যুবক এলিয়ট (ফ্রান্সে)

টি এস এলিয়টের কাব্যের মুগ্ধ পাঠক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'দা জার্নি অব দা মেজাই' কবিতা তাঁর অনুবাদে 'তীর্থযাত্রী' :

'কন্‌কনে ঠান্ডায় আমাদের যাত্রা,
ভ্রমণটা বিষম দীর্ঘ, সময়টা সবচেয়ে খারাপ,
রাস্তা ঘোরালো, ধারালো বাতাসের চোট,
একেবারে দুর্জয় শীত।

এলিয়টের বিখ্যাত কবিতা 'দা ওয়েস্ট ল্যান্ডে'রও আংশিক অনুবাদ করেছেন রবীন্দ্রনাথ :

এ ঘরে ও ঘরে যাবার রাস্তায় সিদ্ধ মাংসের গন্ধ,
তাই নিয়ে শীতের সন্ধ্যা জমে এল।
এখন ছ'টা।
ধোঁয়াটে দিন, পোড়া বাতি শেষ অংশে ঠেকল।
বাদলের হাওয়া পায়ের কাছে উড়িয়ে আনে
পোড়ো জমি থেকে ঝুলমাখা শুকনো পাতা
আর ছেঁড়া খবরের কাগজ।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : আজকের দিনে যে সাহিত্য আধুনিক ধর্ম মেনেছে, সে সাবেককালের কৌলিন্যের লক্ষণ সাবধানে মিলিয়ে জাত বাঁচিয়ে চলাকে অবজ্ঞা করে, তার বাছবিচার নেই। এলিয়টের কাব্য এইরকম হালের কাব্য।....

টি এস এলিয়ট অবশ্য শুধু কবি নন। নাট্যকার এবং প্রাবন্ধিকও। তাঁর নাটক 'মার্ডার ইন দা ক্যাথিড্রাল' 'ফ্যামিলি রি-ইউনিয়ন' 'দা ককটেল পার্টি' 'দা কনফিডেনশিয়াল ক্লার্ক' কিংবা প্রবন্ধ সংকলন 'দা সেক্রেট উড' সাহিত্যে মূল্যবান সংযোজন।

এবছর এলিয়টের জন্মশতবর্ষ। তাঁর জন্ম আমেরিকার মিসৌরির সেন্ট লুইসে। ১৮৮৮ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর। জন্মসূত্রে আমেরিকান হলেও পরবর্তীকালে ইংল্যান্ডে থাকেন তিনি। ইংল্যান্ডের নাগরিকত্বও গ্রহণ করেন। জীবনের শেষদিকে এলিয়ট লিখেছেন : 'আমার জীবনের মাত্র দুটি পর্ব   শুধু সে দুটি পর্বেই আমি সুখী ছিলাম আমার ছেলেবেলা আর দ্বিতীয় বিবাহিত জীবন।'

২৬৩৫ নং লোকাস্ট স্ট্রিটে তাঁদের বাড়িটা বেশ বড়। দোতলা। অনেক কাজের লোক। রাঁধুনি, নার্স, কাপড় কাচার লোক, মালী, ফাইফরমাশ খাটার লোক   কারুরই অভাব নেই। এই পরিবারে তিনিই শেষ সন্তান। তাই তাঁর আদর একটু বেশি।

এলিয়টের বাবা-মা দুজনেরই বয়েস চল্লিশের ওপর। তাঁদের বিয়ে হয়েছে বছর কুড়ি। এই সময়েই জন্ম এলিয়টের। পুরো নাম রাখা হল : টমাস স্টার্নস এলিয়ট। তাঁর চার দিদি। বড়দি অ্যাডা উনিশ বছরের বড়। এক ভাই হেনরি। ন বছরের বড়। আর এক ভাই থিওডোর। কয়েকমাস বয়েসেই মারা যায়।

এ পরিবারের ওপর সব থেকে প্রভাব ঠাকুরদা উইলিয়াম এলিয়টের। টমাসের জন্মের এক বছর আগে তিনি মারা যান। টমাস পরে লিখেছেন : 'আমার ঠাকুর্দা এখনও শাসন করে চলেছেন তাঁর ছেলেদের, নাতিদের   কবরখানা থেকে।' উইলিয়াম ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী। তাঁর জীবনে কর্তব্যই সব থেকে বড় কথা।

ছেলেবেলা থেকেই টমাস দেখেন তাঁর পরিবারের লোকেরা সমাজসেবা নিয়ে ব্যস্ত। কেউ কেউ শিক্ষকতা করেন। কেউ বা মন্ত্রিসভার সঙ্গে যুক্ত। বাবা হেনরি এলিয়ট কিন্তু অন্য পথে পা বাড়ালেন। তিনি শুরু করলেন ব্যবসা। রীতিমত জাঁকিয়ে। অবশ্য চেয়েছিলেন চিত্রশিল্পী হতে। পারেননি। শিল্পীর জীবন তখন মোটেও অর্থকরী ছিল না। মনের দিক থেকে টমাস কখনই বাবার কাছাকাছি আসতে পারেননি। তাছাড়া টমাসের জন্ম থেকেই প্রায় বধির হয়ে গিয়েছিলেন হেনরি। মা শার্লেটি অবশ্য অনেক কাছের। ছেলেমেয়েদের মধ্যে টমাসই একমাত্র তাঁর মুখশ্রী পেয়েছে।



ভিভিয়েট এলিয়ট

নিজেকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন ছিল শার্লেটের। স্কুলের মেধাবী ছাত্রী তিনি। কিন্তু কলেজে পড়ার সুযোগ হয়নি। সে স্বপ্ন পূরণ করবে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র। এ বিশ্বাস তাঁর আছে। মায়ের স্বপ্ন সত্যিই পূরণ করেছেন টমাস। মা-ই তাঁকে উৎসাহ যুগিয়েছেন মেকলে-র 'হিস্ট্রি অব ইংল্যান্ড' পড়তে। কিংবা বার্গসনের 'ইন্ট্রোডাকশান টু এ নিউ ফিলসফি'।

মা ছাড়া ছেলেবেলায় আর একজন নারীর সান্নিধ্য এলিয়টের ভাল লেগেছে। অ্যানি ডান। নার্স তিনি। ক্যাথলিক খ্রিস্টান। এলিয়টের তখন ছ'বছর বয়েস। তখনই অ্যানি তাঁকে বোঝান, ঈশ্বর আছেন। প্রমাণ দেওয়াও সম্ভব।

এলিয়ট চুপচাপ থাকতে ভালবাসেন। মাথার মধ্যে নানা চিন্তার আনাগোনা। চোখে মুখে এক আশ্চর্য উজ্জ্বলতা। গ্রীষ্মের দিনগুলোয় এলিয়ট পরিবার বেড়াতে বের হন। হ্যামটন বিচ, নিউ হ্যামশায়ার কিংবা গ্লস্টার। অ্যাটলান্টিক সমুদ্রের ধারে গ্লস্টারের সৌন্দর্য মুগ্ধ হয়ে উপভোগ করেন এলিয়ট। মাঝে মাঝে সমুদ্রের জলে নৌকো নিয়ে ভেসেও পড়েন। সমুদ্র তাঁকে নেশার মত টানে।

পাখিদের প্রতিও গভীর অনুরাগ এলিয়টের। তাঁর চোদ্দ বছরের জন্মদিনে একটা বই উপহার পান : 'হ্যান্ডবুক অব বার্ডস অব ইস্টার্ন নর্থ আমেরিকা'। তাঁর দেখা পাখিদের ছবির পাশে পেন্সিলের দাগ দিয়ে রাখেন তিনি।

দশ বছর বয়েসে এলিয়ট 'স্মিথ একাডেমি'তে ভর্তি হন। এখানে থাকতেই শেখেন গ্রিক, ল্যাটিন, ফরাসি, জার্মান ভাষা। প্রাচীন ইতিহাস। আর ইংরেজি। হোমারের 'ইলিয়ড', ভার্জিলের 'ইনিড', শেকসপিয়রের 'ওথেলো', উগো-র 'লে মিজারেবল', মলিয়ে-র 'লা মিসানথ্রপ' প্রিয় বই তাঁর।

বছর চোদ্দ বয়েস তখন। হঠাৎ হাতে পড়ল 'রুবাইয়াত অব ওমর খৈয়াম'। এডওয়ার্ড ফিটজেরাল্ডের অনুবাদ। এলিয়ট এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেললেন। জন্ম নিলো কবিতার প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ।

একদিন দাঁতের ডাক্তারের কাছে গেছেন। রোগীর ভিড়। অপেক্ষা করতে হচ্ছে কিছুক্ষণ। হঠাৎ চোখে পড়ল এডগার অ্যালেন পো-র ছোট গল্পের বই। পড়তে শুরু করলেন 'দি অ্যাসিগনেশন'। পড়ার মাঝখানেই উঠতে হল ডাক্তারের ডাকে। পরে যতক্ষণ না পুরো গল্পটা পড়তে পেরেছেন ছটফট করেছেন তিনি।

স্মিথ একাডেমি থেকে ভালই গ্রেড পেলেন এলিয়ট। ল্যাটিনে পুরস্কার পেলেন। ১৯০৫-এর শেষ দিকে গেলেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করলেন। লম্বা রোগা কিন্তু আকর্ষণীয় চেহারা তাঁর। অনেকেরই নজর কাড়ে। হালকা রঙের শার্ট, টাই, চেন দিয়ে বাঁধা ঘড়ি, জ্যাকেটের বুক-পকেটে রুমাল। নাটক দেখে, কনসার্ট শুনে অবসর সময় কাটে তাঁর। বাকি সময় শুধুই পড়াশুনো।

হার্ভার্ড থেকে পাশ করে এলিয়ট গেলেন প্যারিসে। কিন্তু এখানে মন বসে না। নিঃসঙ্গতা গ্রাস করে তাঁর মনকে। সিগারেটের প্রচণ্ড নেশা পেয়ে বসে তাঁকে। মুক্তি খুঁজে পান কাব্যের জগতে। কবিতা লিখে চলেন। একের পর এক। এগুলো যেন একই সূত্রে গাঁথা। আশ্চর্য এই, এ কবিতায় মেয়েদের প্রতি তাঁর ভয় আর ঘৃণার ভাব ফুটে উঠল। 'মেয়ে বলতে এ পর্যন্ত মা, বোন আর নার্সের সান্নিধ্যই পেয়েছি। অন্য মেয়ের সাহচর্য এখনও পাইনি।' এ কথা এলিয়ট লিখছেন ছাব্বিশ বছর বয়েসে।

১৯১৫ সালে কবি হিসেবে খ্যাতি ছড়াল এলিয়টের। সে বছরই তাঁর জীবনধারা

একেবারে পালটে গেল। আলাপ হল ভিভিয়েন হেই উডের সংগে। ভিভিয়েন তেমন সুন্দরী নন। ছিপছিপে চেহারা তাঁর। তবু তাঁকে ভাল লাগল এলিয়টের। তিনি তখন ইংল্যান্ডে। অক্সফোর্ডে। বন্ধু স্কোফিল্ড থেয়ারের বোন লুসি। তাঁর বন্ধু ভিভিয়েন। তাঁরা দুজনে প্রায়ই আসেন এলিয়টের কাছে। কত অলস মুহূর্ত হৈ হৈ করে কেটে যায়। লুসির থেকে ভিভিয়েনকেই বেশি ভাল লাগে এলিয়টের। তাঁর রহস্য করে কথা বলা, আয়ত চোখ তুলে তাকানো, মিষ্টি করে হাসা – সবই ভাল লাগে এলিয়টের।

কিন্তু হঠাৎ মন ভেঙে গেল। ভিভিয়েন কি থেয়ারকে ভালবাসে ? থেয়ারও বোধহয় –। আর ভাবতে পারেন না এলিয়ট। শেষ পর্যন্ত ভিভিয়েনকেই একদিন সোজাসুজি প্রশ্ন করেন, 'ভিভিয়েন, একটা কথা বলবে ?'
'বলো।'
তাঁরা দুজনে তখন নৌকোর ওপরে। লগি ঠেলছেন এলিয়ট। জলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ। এলিয়ট বললেন, 'সত্যি বলো তো, কাকে ভালবাসো তুমি – আমাকে না, থেয়ারকে ?'
মুহূর্তে লাল হয়ে গেল ভিভিয়েনের মুখ। বললেন, 'কি বলছ তুমি ! থেয়ার আমার বান্ধবীর দাদা ! দেখা হলে হেসেই কথা বলি। কিন্তু তাই বলে –। না, না, এ তুমি কি করে ভাবলে টমাস ?'
এলিয়টের মন তখন খুশিতে দুলে উঠেছে, 'সত্যি বলছ ভিভিয়েন সত্যি বলছ ? তুমি শুধু আমাকেই ভালবাসো ? আর কাউকে নয়
এলিয়টের বুকের মধ্যে মাথা রেখে পরম মমতায় বলেন ভিভিয়েন, 'আমি শুধু তোমাকেই ভালবাসি। আর ভালবেসে যেতে চাই আজীবন।'
ভিভিয়েনের মন প্রাণ প্রাচুর্যে ভরা। নিজের সম্পর্কে সচেতন তিনি। একটু বেশি অনুভূতিপ্রবণ। পোশাক আশাকের দিকে গভীর মনোযোগ তাঁর। ভালবাসেন নাটক দেখতে। সংগীত আর নাচের আসরে যেতে।
এসবই এলিয়টের ভাবনার সংগে মিলে যায়। ভিভিয়েন তাঁর থেকে ছ মাসের বড়। তবু তাঁকে বিয়ে করার কথা ভাবেন এলিয়ট।
ভিভিয়েন এর আগে চার্লস বাকল নামে এক শিক্ষককে ভালবেসে ছিলেন। তাঁকে রুচিশীল বলেই ভেবেছিলেন ভিভিয়েন। কিন্তু কদিন পরেই দেখলেন তাঁর ধারণা ভুল। চার্লসের মধ্যে গভীর অনুভূতির কোন বালাই নেই। তাঁর সংগে কথা বলতে মাথা ধরে যায় ভিভিয়েনের। আস্তে আস্তে নিজেকে সরিয়ে আনেন চার্লসের জীবন থেকে। এর পরেই আলাপ এলিয়টের সংগে। মনে হয়, ইনিই তাঁর আদর্শ পুরুষ। এলিয়টও মুগ্ধ হলেন তাঁর আভিজাত্যবোধ আর রুচিশীলতায়।
বিয়ে হয়ে গেল। ২৬ জুন ১৯১৫। দুজনের স্বপ্নের জগৎ বাস্তব হল আজ। সুখের স্রোতে কেটে গেল কিছুদিন।
কিন্তু সে সুখ বেশিদিন স্থায়ী হল না। এলিয়ট জানতে পারলেন ছেলেবেলা থেকে ভিভিয়েন অনেক অসুখে ভুগেছেন। এমনকি, যক্ষার বীজও বাসা বেঁধেছে তাঁর শরীরে। সর্বক্ষণ মাথা ধরা, হাতে পায়ে খিঁচ ধরা লেগেই আছে। তার ওপর মানসিক অস্থিরতা। হোটেলের চাদরও বার বার পরিষ্কার করেন ভিভিয়েন। এলিয়ট বিরক্ত হন। তবু সমস্যা মেটে না। মাঝে মাঝে মরফিন ইনজেকশান দিতে হয় ভিভিয়েনকে।
এলিয়ট একা একা বসে চুপচাপ ভাবেন। এ কি হল ! ভাবলেন সুখের সংসার গড়ে তুলবেন, তা তো হলই না, তার বদলে শুধুই যন্ত্রণা। হার্ভার্ডে তাঁর পুরনো দিনগুলোর কথা ভেবে আরও কষ্ট হয় তাঁর।

লেডি ওটোলিন



এমিলি হেল নামে একটি মেয়েকে প্রেম নিবেদন করেছিলেন তিনি। এমিলি তাঁর সংগে নাটকে অভিনয় করতে এসেছিল। প্রথম দর্শনেই ভালবেসে ফেলেন। তারপর রোজ তার হাতে গোলাপের তোড়া তুলে দিয়েছেন এলিয়ট। মৃদু হেসে এমিলি বলেছিল, 'কেন বলো তো রোজ রোজ আমাকে এত ফুল দাও ?' এলিয়ট একটুও দ্বিধা না করে বলেছিলেন, 'তোমাকে ভালবাসি বলে !' সবই এখন স্বপ্ন বলে মনে হয়। আজ কোথায় তিনি, কোথায় এমিলি। এমিলিকে বিয়ে করার কথা কখনও মাথাতেই আসেনি তাঁর।
ভিভিয়েন আর এলিয়টের বিবাহিত জীবনে শুরু থেকেই দেখা দিল অবিশ্বাস আর ভুল বোঝাবুঝি। তাঁদের দু সপ্তাহের মধুচন্দ্রিমা ছ দিনেই শেষ হয়ে গেল। ভিভিয়েনের পরিবারের সংগেও বনিবনা হল না এলিয়টের।

তবু এলিয়ট তাঁর স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত। ভিভিয়েনের অসুখ ক্রমেই ঘোরালো হয়ে উঠছে। এলিয়ট হাসিমুখে সেবা করে চলেছেন। রাতে ঘুম হয় না ভিভিয়েনের। সারা রাত পাশে জেগে থাকেন এলিয়টও। বলেন, 'ভিভিয়েন, সমুদ্রের ধারে যাবে বেড়াতে সমুদ্র আমার ভীষণ ভাল লাগে।'
অনেক কষ্টে ভিভিয়েন বলেন, 'চলো।' টর্কওয়ে গেলেন দুজনে। একটু ভালও হয়ে উঠলেন ভিভিয়েন। কিন্তু ক'দিনের জন্যে ? ডাক্তার আর ওষুধে অনেক খরচ হচ্ছে এলিয়টের। স্কুলে শিক্ষকতার কাজ নিলেন তিনি। ছাত্রদের আলাদা পড়াতে লাগলেন। বইয়ের সমালোচনা লেখার কাজও শুরু করলেন।
শেষ পর্যন্ত লন্ডনে পাকাপাকিভাবে থাকার কথা ভাবলেন এলিয়ট। এখানকার জল-হাওয়ায় হয়ত ভাল থাকবে ভিভিয়েন। তাছাড়া, অন্য আকর্ষণও আছে। সাহিত্যের পরিমণ্ডলে থাকার সুযোগ পাবেন তিনি।
চলে গেলেন লন্ডন। কিন্তু সুখ এলো না জীবনে। ভিভিয়েন মনে মনে তাঁকে অশ্রদ্ধা করেন। এ ব্যথা কিছুতেই ভুলতে পারেন না এলিয়ট।
১৯১৭ সালে 'লয়েডস' ব্যাংকে যোগ দিলেন এলিয়ট। মনের যোগ নেই এ

কাজের সংগে। তবে উপার্জন আরও বেশি।

এই সময় এলিয়ট আবার কবিতার আশ্রয়ে মুক্তি খোঁজেন। এবং আশ্চর্য, লেখেন প্রেমের কবিতা :

'দাঁড়াও সিঁড়ির সব উঁচু পইঠায়
কুসুমবেদীর গায়ে হেলান দাও
সূর্যালোক বোনো বোনো তোমার চুলের ছায়ায়,
ফুলগুলি তোমার ঝাপটে ধরো করুণ বিস্ময়ে,
ছুঁড়ে দাও মাটিতে আর ফিরে তাকাও
উড়ন্ত বিরাগ এক তোমার চোখের আশ্রয়ে
তবু বোনো সূর্যালোক বোনো তোমার চুলের ছায়ায়।'
(ভাষান্তর : বিষ্ণু দে)

রুগ্ন স্ত্রীর দিক থেকে এখন অনেকটাই মুখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছেন এলিয়ট। অন্য নারীর সান্নিধ্যে অনেক বেশি আনন্দে সময় কাটে তাঁর। লেডি ওটোলিন মোরেল, এডিথ সিটওয়েল, ন্যানসি কুনার্ড, মেরি হাচিনশন, ভার্জিনিয়া উলফ্। এঁদের কাছে স্বচ্ছন্দ তিনি। মনকে উজাড় করে দিতে পারেন মুহূর্তের মধ্যে। এর মধ্যে লেডি ওটোনিল মোরেলকেই সব থেকে কাছের



দান্তে গোল্ড মেডেল পাবার অনুষ্ঠানে ফ্লোরেন্সে (১৯৫৯)

মনে হয়।

১৯৩২ সালে ভিভিয়েনের সংগে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল তাঁর। এলিয়ট তাঁর কাছ থেকে কতটুকু পেয়েছেন জীবনে? তবু মনে হল, হৃদয়টা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। ভালবাসার ফল্গুধারা কি অন্তঃসলিলা হয়েই বয়ে

এলিয়ট ও ভ্যালেরি (১৯৫৮)



গেছে এতদিন?

এ সময় হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ধারাবাহিক বক্তৃতা দেবার আমন্ত্রণ পেলেন এলিয়ট। সতের বছর পর আবার আমেরিকায় যাওয়া। পুরনো দিনের কত স্মৃতি ভেসে উঠল মনে। ভিভিয়েন তখন একা। একেবারেই একা।

১৯৩৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর 'টাইমস' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিলেন ভিভিয়েন : 'টি এস এলিয়ট – যিনি ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩২-এ বাড়ি ছেড়েছেন। আমেরিকায় বেড়াতে যাচ্ছেন বলে – তিনি কি দয়া করে ফিরে আসবেন তাঁর ৬৮ নং ক্লারেন্স গেট গার্ডেনসের বাড়িতে?'

ফিরলেন না এলিয়ট। ছ বছর কেটে গেল। আবার যোগাযোগ হল এমিলি হেলের সংগে। তাঁর পুরনো প্রেমিকা। অনেকেই ভেবে নিলেন, এলিয়ট এমিলিকেই এবারে বিয়ে করবেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তা হল না।

১৯৩৫ সালে ভিভিয়েন জোর করে দেখা করলেন এলিয়টের সংগে। বললেন, 'তুমি কি আর ফিরবে না বাড়িতে? কেন, কি করেছি আমি?'

এলিয়টের স্পষ্ট উত্তর, 'এখন তোমার সংগে কথা বলার সময় নেই আমার।'

১৯৩৮-এর অগাস্ট মাসে মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করতে হল ভিভিয়েনকে। সেখানের মারা যান তিনি। ১৯৪৭-এর ২২ জানুয়ারি।

এলিয়টের মনের মধ্যে দুঃসহ ব্যথা। নিজেকে অপরাধী বলে মনে হয়। সে ব্যথা ভুলতে ডুবে থাকেন কাজের মধ্যে। লেখা আর লেখা। মঞ্চে তাঁর নাটক অভিনীত হয়। ফিল্মও হয় সে নাটক। 'ফেবার অ্যান্ড ফেবার' কোম্পানির অন্যতম প্রকাশকও তিনি। তাঁর অনেক বই প্রকাশিত হয় এখান থেকে।

তাঁর ব্যক্তিগত সেক্রেটারি : ভ্যালেরি ফ্লেচার। তরুণী তিনি। যথেষ্ট চটপটে। চোদ্দ বছর বয়েসে প্রথম কণ্ঠস্বর শোনেন এলিয়টের। রেডিয়োতে। 'দা জার্নি অব দা মেজাই' কবিতার উদাত্ত আবৃত্তি। 'দুর্দান্ত হয়েছিল সে আবৃত্তি। তখনই মনে হয়েছিল, যদি কোনদিন এলিয়টের সংগে কাজ করার সুযোগ পেতাম! আশ্চর্য, তাই হল।'

১৯৫৬ সালের শেষ দিক। ততদিনে আট বছর কাজের সূত্রে কেটে গেছে

ভ্যালেরির সংগে। এতদিনে এলিয়টের মনে হয়েছে, তাঁর নিঃসংগ জীবনে ভ্যালেরিই একমাত্র আলো। অফিসে বসেই সেদিন এলিয়ট প্রস্তাব রাখলেন ভ্যালেরির কাছে, 'জানি, তুমি আমার থেকে বয়েসে অনেক ছোট। তবু তোমাকে কাছে পাবার ইচ্ছে মনের গভীরে। আমাকে বিয়ে করবে, ভ্যালেরি?'

কিছুক্ষণ নিষ্পলক তাকিয়ে রইলেন ভ্যালেরি। এলিয়টের জীবনের সুখ দুঃখের সংগে তাঁর জীবনও জড়িয়ে গেছে আজ। মনে তবু দ্বিধা, এলিয়টের এ অনুরাগ স্থায়ী হবে তো?

বেশি ভাববার সময় পেলেন না। এলিয়ট উত্তেজিত, 'চুপ করে থাকলে চলবে না। বলো?'

একটু হেসে ভ্যালেরি বললেন, 'বেশ। তাই হোক।'

১৯৫৭-র ১০ জানুয়ারি। ভোর ছটা পনের মিনিটে বিয়ে হল। সেন্ট বার্নাবাস চার্চে। তখনও অন্ধকার কেটে গিয়ে দিনের আলো স্পষ্ট হয়নি। এলিয়ট ভাবতে থাকেন, এবার সূর্য উঠবে। নতুন সূর্য।

তিন সপ্তাহের মধুচন্দ্রিমা কাটল মেন্টনে। তারপর ফিরে এলেন লন্ডনে' ব্রংকাইটিস দেখা দিল এলিয়টের। আস্তে আস্তে সেরে উঠলেন। নতুন ফ্ল্যাট মনের মত করে সাজালেন ভ্যালেরি। এলিয়ট মুগ্ধ বিস্ময়ে উপভোগ করেন ভ্যালেরির সৌন্দর্যবোধ।

দুজনকে কখনও আলাদা দেখা যায় না। পার্টিতে একজনের হাত সবসময়ই অন্যের হাতের মধ্যে ধরা। এলিয়ট সকালে লিখতে বসেন। বিকেলে ভ্যালেরিকে নিয়ে বেড়াতে বের হন কেনসিংটন গার্ডেনসে। পুকুরের জলে ছোট ছোট বোট-এর ভেসে যাওয়া দেখতে দেখতে মন উদাস হয়ে যায় তাঁর।

এখন এলিয়ট অনেক বন্ধুবৎসল। একসময় নাচের ক্লাসে যেতে খুব ভাল লাগত তাঁর। এখন আবার যেতে ইচ্ছে করছে, 'ভাবছি আবার শুরু করব। ও কতদিন নাচ শিখতে যাইনি আমি।'

এ সময় 'দি এল্ডার স্টেটসম্যান' মঞ্চস্থ হল। প্রথমে আমেরিকায়। পরে লন্ডনে। আশা ছিল, এ নাটক জমে যাবে। কিন্তু তা হল না। অন্য সময়



এলিয়ট ও ভ্যালেরি (১৯৬৩)

হলে এলিয়ট নিরাশ হয়ে পড়তেন। কিন্তু এখন সুখের স্রোতে ভাসছেন তিনি। কোন ঝড়ের ঝাপটাই লাগে না তাঁর মনে।

এলিয়ট এখন প্রায় ঐতিহাসিক হয়ে উঠেছেন। সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর স্থান আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। দান্তে গোল্ড মেডেল পেয়েছেন। তাঁর আগে নোবেল পুরস্কার। তবু কাজের মধ্যে থেকে ছুটি নিতে তাঁর মন চায় এখন। প্রায়ই বেরিয়ে পড়েন বেড়াতে। কখনও উত্তর আফ্রিকা, কখনও আমেরিকা। সংগী ভ্যালেরি। তাঁকে তিনি মন প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছেন। সে ভালবাসা ভ্যালেরির হৃদয়েও ঢেউ তুলেছে।

কিন্তু শরীর যেন আর বইছে না। গেলেন নাসার্ড লিডস। কিন্তু উপকার হল না। ফিরে এলেন বাড়িতে। অসুস্থতা ক্রমেই বেড়ে চলল। শেষ পর্যন্ত নিয়ে যেতে হল হাসপাতালে। শরীরের বাঁদিকে কোন সাড় নেই। কথা বলতে হচ্ছে খুব কষ্ট করে। বুকের ওঠা নামা হাপরের মত। স্ত্রী ভ্যালেরি সর্বক্ষণ পাশে বসে। ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে যায়। তাঁর হাত ছাড়েন না এলিয়ট। এক সময় প্রায় অস্ফুট স্বরে বলেন, 'আমি পেরেছি। বোধহয় পেরেছি। যা করতে চেয়েছিলাম –। আজ বিদায় নেবার সময় –'

তাড়াতাড়ি এলিয়টের মুখে হাত চাপা দেন ভ্যালেরি, 'ও কথা বোলো না।' চোখের জল কিছুতেই সামলাতে পারেন না, 'আর যা খুশি বলো তোমার, শুধু চলে যাবার কথা বলো না।'

তবু চলে গেলেন এলিয়ট। সাতাত্তর বছর বয়েসে। ১৯৬৫ সালের ৪ জানুয়ারি। শূন্য হয়ে গেল ভ্যালেরির জীবন। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে শুধু এইটুকুই বলতে পারলেন, 'টমাস 'কবি' হতে চেয়েছিল। তার জন্য অনেক মূল্য দিতে হয়েছে তাকে। তবু সে কবি হতে পেরেছে – এটাই তার পরম প্রাপ্তি।'

সেন্ট মাইকেল চার্চে এলিয়টের স্মৃতিস্তম্ভে লেখা হল : 'মনে রেখো কবি টমাস স্টার্নস এলিয়টকে। তাঁর জীবন শুরুতেই শেষ, আবার শেষেই শুরু।' □

শুভেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

[পরবর্তী সংখ্যায় হেনরিক ইবসেন]

গল্প



ফিকির

আশিস ভট্টাচার্য

খবরটা পুঁটেই দিয়েছিল। অনেক বেলায় দুটো খেতে বসেছিল গিন্ধু। হঠাৎ ডাকাডাকি শুনে ভাতের থালা ফেলে এঁটো হাতেই বেরিয়ে এল ঝুপড়ি থেকে। পুঁটে ইশারায় তাকে নিয়ে গেল খানিক দূরে। তারপর হাত নেড়ে নেড়ে কী যেন বোঝাতে লাগল এবং গিন্ধুও এঁটো হাতটা চাটতে চাটতে বেশ মনোযোগ দিয়েই তা শুনছিল। গিন্ধুর বউ ঝুপড়ির ফোকর দিয়ে এইটুকুই শুধু দেখতে পেল।

একটু বাদেই গিন্ধু ফিরে এল ঝুপড়িতে। কিছুটা যেন চিন্তিত। একটু ব্যস্ত ভাব। খপ্ খপ্ করে ডাবায় হাতটা ধুয়ে নিয়ে দরমার খোঁচে ঝোলান তালিমারা শার্টটা গায়ে চাপাতে চাপাতে বউকে বলল, কাতার দড়ি দিতে পারিস ?

চাঁপি কোনো উত্তর দিল না। উল্টে শুধোলো, 'ভাতগুলা কি পড়ে থাকপে ?' গিন্ধু কী যেন চিন্তা করছিল। বলল, 'খিদা নাই। যা চাইচি দে।'

– কট্টুকু লাইগবে ?

– তা বেশ বড়ই দরকার।

– কী কামে লাইগবে ?

– অতশত ক্যাচালে আমার কাম নাই। গিন্ধু বিরক্তি নিয়ে কোমরের গিঁটটা শক্ত করে বেঁধে লুঙ্গিটা ঝেড়ে নিল। চাঁপি ওর দিকে তাকিয়ে রইল খানিক। এদিক ওদিক খোঁজাখুঁজি করে চাঁপির ন্যাকড়া-চোকরার পুঁটুলিতে শাড়ির ছেঁড়া পাড় ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না। গিন্ধু, 'ধুস্ শালা !' বলে বেরিয়ে যাবার মুখে হঠাৎ থমকে গিয়ে বলল, 'কটা ট্যাকা দিতে পারিস ? রেতের বেলায় সুদে আসলে পুষিয়ে দেবো।'

গিন্ধুর বউ কী বুঝল তা সে-ই জানে। মুখ ঝামটা দিয়ে বলে উঠল, 'কতার ছিড়ি দ্যাখো ! সুদে আসলে –, খেতি দিবার মুরোদ নেই গতর খাবার বেলায় আচে।' গিন্ধু কিন্তু আজ আর ওর কথায় রাগ করল না। শুধু বলল, 'আমি তা বলিনি চাঁপি। আমি সত্যি সুদের কথাই বলিচি। যেমন তুই দু ট্যাকা দিলে সুদে আসলে আড়াই ট্যাকা পাবি।'

– বাপরে ! ট্যাকার কল কিনিচো নাকি ? চাঁপি ভেঙচে ওঠে।

– হ্যাঁ হ্যা, ট্যাকারই কল। রেতে বুঝবি। অখন তাড়াতাড়ি কর নইলে মাল বেহাত হইযাবে।

গিন্ধু গজ গজ করে।

চাঁপিও বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে – আচ্ছা জ্বালা তো ! ট্যাকা পাবো কুথায় ?'

– তাইলে এট্টা ছিঁড়া শাড়ি দে।

ঠান্ডা গলায় বলে গিন্ধু।

এই একটা কথাতেই চাঁপি জ্বলে ওঠে।

– 'শাড়ি ! কোনমুখে কতা কস্ মিনসে। ভাতার হইয়ে অ্যাদ্দিনে কয়টা শাড়ি দিইচিস, অ্যাঁ – ?

গিন্ধু আর কথা বাড়ায়নি। ঝুপড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছে। ট্যাঁক থেকে একটা বিড়ি বার করে ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া টেনে সোজা হাঁটা দিয়েছে রাজাবাজার ট্রামডিপোর দিকে।

গিন্ধু চলে যেতেই চাঁপির হঠাৎ খেয়াল হলো –তাইতো, এই অবেলায় মানুষটার হলো কী ? চাঁপির কপালটা কুঁচকে উঠলো হঠাৎ।

পুঁটে গিন্ধুর ছিনতাই আর মাল খাবার

সংগী। চাঁপি তা ভালো করেই জানে। কিন্তু এদুটো কাজে তার কাতার দড়ি বা ছেঁড়া শাড়ির কী ব্যবহার তা সে জানে না। বিয়ে হওয়া ইস্তক এমন ঘটনাও কোনোদিন ঘটেনি। আজ এমন কী ঘটল যে গিন্ধু ব্যস্ত হয়ে পড়ল। অন্য সময় হলে সে হয়তো কিছু ভাবত না। কিন্তু আজকের ব্যাপারটায় কোথায় যেন একটা গোলমাল আছে। কেমন একটা রহস্যের গন্ধ পাচ্ছে সে। এবার তার সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল পুঁটের ওপর। ভনিা দুপুর বেলায় এসে গিন্ধুর কানে কানে কী গুরুমন্তর সে দিয়ে গেল কে জানে!

গিন্ধুর একটা ভালো নাম আছে – গিরিধারি। পদবী হালদার। জাতে মালো। নিবাস ছিল বনগাঁ। অভাবের তাড়নায় কলকাতায় আসে। সে শুনেছিল, শহরে নাকি কাজ পড়ে থাকে। যে ধরে নিতে পারে লক্ষ্মী তারই। ওই আশাতেই এসেছিল সে। কিন্তু রেল প্ল্যাটফর্ম আর ফুটপাথে দিন কাটিয়েও সে কাজ ধরতে পারেনি। দৈবাৎ পুঁটের সঙ্গে দেখা হয়ে না গেলে হয়তো কোনোদিনই আর কাজ ধরা হতো না তার। ফুটপাথেই না খেয়ে শুকিয়ে মরতে হতো তাকে।
পুঁটে পকেটমার। শিয়ালদহ স্টেশন চত্বরেই তার কাজ। সঠিক কোনো ডেরা নেই। তিন কুলে কেউ নেই। একটা মনোমত সংগী সেও খুঁজছিল অনেকদিন ধরেই। কারণ এসব কাজে ভালো সাঙাতের গুরুত্ব অনেক। কারণ একা সব সময়ই বোকা। বিপদের ঝুঁকি বেশি। এমনি সময়েই হঠাৎ চোখে ধরে গেল গিরিধারিকে। পুঁটে হাতে চাঁদ পেল। আর এই গিরিধারিই 'লাইনে' এসে হলো গিন্ধু। জীবনের মোড় ঘুরল তার। তাজা যৌবন নিঙড়ে এনতার মাল কামাতে লাগলো। কিছু এলো, কিছু উড়লো। ডেরা তৈরি হলো রাজাবাজার বস্তিতে। সাদিও করল। কালীঘাট থেকে মাথায় সিঁদুর পরিয়ে নিয়ে এল পেয়ারের কোনো এক চম্পারানীকে। বছর ঘুরতে ঘর ভরে উঠল। বাল-বাচ্চার সংখ্যা দাঁড়াল চার-এ। শুধু পরিবর্তন হলো না পুঁটের। আজও তার সঠিক কোনো আস্তানা নেই। শুধু রাতের ঠিকানাটা কোনো মেয়েছেলের ঘরে।

গিন্ধু বেরিয়ে যাবার কিছু পরে চাঁপি একটু শুয়েছিল। দুপর গড়িয়ে তখন বিকেল নামছে। বাচ্চাগুলো খেয়েদেয়ে সেই কখন বেরিয়ে গেছে। ওরা যে কোথায় যায় আর কী করে, চাঁপি তার খোঁজ রাখে না। জন্ম দেবার কথা তার, সে তা দিয়েছে। বাকি দায়িত্ব গিন্ধুর। সে তাদের বাপ, আর আছেন ওপরওলা। রাখলে তিনি রাখবেন, মারলে মারবেন।

কিন্তু গিন্ধু আজ কোন কাজে গেল এই চিন্তাটা ক্রমশ মাথার মধ্যে পাক খেতে থাকে চাঁপির। আকাশ-পাতাল ভাবনা জড়ো হয়, চাঁপি উঠে পড়ে। মাটির পোড়া হাঁড়িটার দিকে তাকায়। জল দেওয়া ভাত পড়ে আছে। অন্যদিনের মতো সেই ভিকিরিটা আজ আসেনি। লোকটা প্রতিদিনই ভাতফোটার গন্ধ পেয়ে তার শীর্ণ দুটো হাত মেলে ধরে চাঁপিকে বলে, 'মা, এট্টু ভাত দিবা?' ওর কংকালসার দেহটার কথা মনে হতেই চাঁপি গিন্ধুর কথা ভাবে। গিন্ধুও একদিন এমনি বুড়ো হয়ে যাবে। ইদানীং গিন্ধুর শরীরটাও ভালো যাচ্ছে না। আজকাল কাজ করে সামাল দিতে পারে না। প্রায়ই ধরা পড়ে। বেদম মার খেয়ে বাড়ি আসে। নয়তো পুঁটের সঙ্গে মাল খেয়ে সারারাত বাইরেই কাটায়।

ঝুপড়ির বাইরে এল চাঁপি। সন্ধে গড়াতে কতক্ষণ। আঁট-সাঁট করে চুল বাঁধল সে। সিঁথিতে সিঁদুর দিল। লাল সিঁদুরের টিপ পরল কপালে। টিপ পরতে গিয়ে বরাবরই খানিকটা সিঁদুরের ছিটে পড়ে ওর নাকের ডগায়। নিজেকে ভারী সোহাগী মনে করে সে। আর তখনই মনে আসে জীবনের অনিশ্চয়তার কথা। কাল কী ঘটবে সে জানে না। গিন্ধুতো আর বাবুদের মতো চাকরি করে না। জীবন নিয়ে রীতিমতো জুয়া খেলে। আর খেলায় হার-জিৎ তো থাকবেই। হয়তো কোনোদিন একটা খাটিয়ায় চেপে তার ঘরের সামনে এসে থামবে গিন্ধু। কথা বলবে না। তার ঝাঁকড়া চুলে জিউলির আঠার মতো মাখানো থাকবে চাপ চাপ রক্ত। থুতনিটা ফেটে হাঁ হয়ে রইবে। ফোলা ফোলা দুটো চোখ। ঠোঁটের কষ বেয়ে গড়ানো রক্তের শুকনো আভাস থেকে যাবে। হয়তো কোনোদিন পুঁটেই এসে খবর দেবে গিন্ধুর লাশ পড়ে আছে বেলেঘাটায় – রেড রোডে – মানিক তলায় কিংবা অন্য কোথাও।
চাঁপি আনমনা হয়ে যায়। দুপুরের কথা ভাবে – কাতার দড়ি, টাকা, ছেঁড়া শাড়ি – এসব কোন কাজে লাগবে তার? আবার ভাবে, হয়তো এবার কোনো বড় দাঁও। কিন্তু ধরা পড়লে গলায় ফাঁস লাগিয়ে মরবে নাকি মানুষটা! আচ্ছা লোক বটে! জিজ্ঞেস করলে কিচ্ছুটি বলবে না। মরুগ গে। গিন্ধু মরলে চাঁপির কী। তার গতর আছে। তার গতর বেচার টাকায় গিন্ধুও খায় আজকাল। অতএব নিজের পথ সে নিজেই দেখে নিতে পারবে। কিন্তু মানুষটার জন্য বড় ভাবনা হয়। বড্ড ভালবাসে তাকে। বড় সোহাগ করে। ওর ওই শক্ত লোমশ বাহুর ভেতর বন্দী হয়েই চাঁপির সুখ। চাঁপি সতী নয়। সতীত্বের তোয়াক্কাও করে না। বহুভোগ্যা সেও। কিন্তু তার মনের মানুষ একটাই – গিন্ধু।
কিন্তু সে গেল কোথায়? খুনখারাপি করতে গেল না তো? একবার তো ছিনতাই করতে গিয়ে খুনের দায়ে পড়ে আর কি! গিন্ধুর মুখেই শোনা, 'গলির অন্ধকারে শালার স্বামীটাকে মাথায় ডান্ডা মেরে দিলাম। চ্যাতন হারালো না শালা। পুঁটে তখন কাপড়ের ফাঁসে মুখ বেঁধে ঠেসে ধরল... ' সঙ্গের বউটার হাত ধরে যাচ্ছিল বাচ্চাটা। তাকে এক ঝটকায় টেনে নিয়ে শক্ত হাতের তেলোয় মুখ চেপে ধরল গিন্ধু। অন্য হাতে চাকু বাগিয়ে বউটার গলায় ঠেকাতেই সে তার হার আর বালা-জোড়া খুলে দিয়েছিল। কিন্তু বেকায়দা হয়ে স্বামীটা যায় যায়। শীতের রাত, রাস্তাটা ছিল নির্জন। কাজ শেষ হতেই বউটা চেঁচিয়ে ওঠে। আর গিন্ধুরাও ধর-ধর, চোর-চোর বলে নিজেরাই চেল্লাতে চেল্লাতে দৌড় দিয়েছিল পাবলিক টের পায়নি। ধোঁকা খেয়েছিল। ধোঁকা খেয়েছিল গিন্ধুরাও। – 'শালা হার আর বালাদুটো ঝুটা ছিল।'
এসব কাজে ঝুঁকি থাকেই। আজ আবার কোন ঝুঁকি নিতে গেল কে জানে! যাবার সময় তো বলে গেল, 'রাতে এলে বুঝবি।...... দু ট্যাকায় আড়াই ট্যাকা – ট্যাকার কল।' চাঁপি আর ভাবতে পারে না।
রাস্তার কল থেকে জল এনে ডাবা

ভরল চাঁপি। রান্নার কাঠখড়ি গুছিয়ে রেখে পরনের শাড়িটাকে কোমরে দুটো গোঁজা মেরে ঠিক করে নিল। তারপর সরষের তেলের খালি শিশিটা হাতে নিয়ে ঘরের ঝাঁপ বন্ধ করে একবার এদিক ওদিক তাকাল। তারপর সোজা হাঁটল শিয়ালদহের দিকে।

শিয়ালদহ স্টেশন চত্বরে সন্ধে হতেই নিয়ন আলো জ্বলে ওঠে। পারুল, লক্ষ্মী, কমলারা ভিড় জমায়। বড় বড় হোর্ডিংয়ের তলায় ফুটপাথ আলো করে বসে থাকে শাক-সবজির মতো।

ইদানীং লাইনে একটা নতুন মেয়ে এসেছে। নাম ময়না। একে বয়েস কম তায় ফরসা। দেমাক আছে বটে। তবে মনটা বড্ড সরল। ভালই টাকা কামায়। চাঁপির টানটুন পড়লে সাহায্যও করে। তবে তা ধার হিসেবে। চাঁপি ঠিক করে নিল আজ ময়নার কাছে হাত পাততেই হবে। একটা পয়সা নেই কাছে। গতর বিকিয়ে রোজগার করতে হয় চাঁপিকেও। কিন্তু এ কদিন একেবারে খরা গেছে মেয়েলী অসুস্থতার জন্যে।

শিয়ালদহে পৌঁছে দেখতে পেল ময়নাকে। উড়ালপুলের তলায় দাঁড়িয়ে চলানীটা পুলিশের সংগে গল্প করছিল। এসব কাজে পুলিশকে হাতে রাখতেই হয়। ময়না তা জানে। আর তাই সেপাইটাকে খুশি রাখার জন্য তার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে চোখ মটকে বারবার কনুইয়ের গুঁতো মারছিল তার ভুঁড়িতে। চাঁপি রাজ্যের বিরক্তি নিয়ে তাকাল খানিকক্ষণ। পুলিশটা গা-ছাড়া হতেই এগিয়ে এসে কোনো ভনিতা না করেই ময়নার কাছে টাকা চাইল।

ময়না চাঁপিকে দেখে হাসল। বলল, 'ট্যাকা? ওতো ছড়িয়ে আছে, কুড়োয় নিগে যা।' চাঁপির মনে হলো ময়না ওকে পাত্তা দিচ্ছে না। শালীর ওই এক দোষ। বড্ড দেমাক। তা হ্যাঁগা, যেদিন ওই গতরে বয়েসের বাতাস লাগবে, গালের টান টান চামড়া ঝুলে পড়বে, সেদিন কী করবি র‍্যা? মনে মনে গজগজ করে চাঁপি।

তবু চাঁপি আবার বিনীত ভাবেই বলল, 'দে না ময়না। কালই দিই দিবো। মাইরী, কালীর দিব্যি।' ময়না একমুখ বিরক্তি নিয়ে ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'ছেনালী করিস নে চাঁপি। সামনে আগুয়ে যা নাগর পাবি, পয়সাও পাবি।

– নাগর? খদ্দের? তুকে তো বলিচি ময়না, আমার –

– আ মেলো। তুর বর রে বর।

– গিন্ধু! কুথায়?

– উইখেনে।

ময়না আঙুল তুলে দেখাল।

– কী কচ্চে?

– গেলেই দেখবি।

ময়না ঘুরল বৈঠকখানা বাজারের দিকে। চাঁপি ব্যাপারটা ঠিক বুঝল না। তবু এগোল। শিয়ালদহ স্টেশন বিল্ডিংয়ের মাথার দুই প্রান্তে দুটো বড় ঘড়ি। ছটা বেজে গেছে ওতে। ছাদের ওপর লাল আলোয় লেখা 'শিয়ালদহ' কথাটা তিন ভাষায় নিভছে আর জ্বলছে পুজো প্যান্ডেলের আলোর মতন। ডান পাশে চওড়া ফুটপাথ। সার বেঁধে উঁচু উঁচু দাঁড়িয়ে আছে নামী দামী কোম্পানির বিশাল সব হোর্ডিং। তারই তলায় অদূরে একটা জটলা।

কাছে যেতেই থমকাল। চাঁপি। খাটিয়ার ওপর ছেঁড়া শাড়িতে ঢাকা একটা মৃতদেহ। পাদুটো বেরিয়ে আছে। গোটা শরীরটা কাতার দড়ি দিয়ে খাটিয়ার সংগে শক্ত করে বাঁধা। মাথার কাছে এক গোছা সস্তা ধূপকাঠি জ্বলছে। আলো আঁধারিতে মুখটা স্পষ্ট দেখা যায় না। তবু চাঁপি পলকহীন চোখে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ। বুকের ভেতরটায় কে যেন হাতুড়ি পিটছে তখন। মৃতদেহের দুচোখে চন্দন দিয়ে সাঁটা দুটো তুলসী পাতাই তার নজরে বড় হয়ে ধরা দিল। চাঁপির বুকটা ধড়াস করে উঠল যখন দেখল পুঁটে বসে আছে খাটিয়ার কাছটায় উবু হয়ে। কপালে রাখা একটা হাত। মাঝে মাঝে ডুকরে উঠছে। চাঁপির সব কিছু যেন এলোমেলো হয়ে গেল। পুঁটের পাশেই চাঁপির দুই ছেলে হ্যাবা আর বিশু দুহাতে মুখ ঢেকে কাঁদছে। খাটিয়ার পায়ার কাছে ফুটপাথের উপর সাদা কাপড় বিছানো। তাতে পয়সা ছুঁড়ে দিচ্ছে পথচলতি মানুষেরা, বাড়িমুখো রেলযাত্রীরা। এদিক ওদিক ছিটকে যাওয়া পয়সাগুলো কুড়িয়ে তুলছে চাঁপিরই তিন বছরের ছোট মেয়ে 'ছোটখুকি'!

তাহলে কি গিন্ধু আজ নিজেকেই শেষ করে দিল!এ কেমন দৃশ্য দেখতে পাঠাল ময়না হতচ্ছাড়ি। চাঁপি আর নিজেকে সামলাতে পারল না। তার মাথাটা ঘুরে উঠল। অসহায়ভাবে একবার চিৎকার করে উঠল, 'ওগো –' তারপর দুচোখে অন্ধকার নেমে আসার মুহূর্তে মনে হলো কোনো বলিষ্ঠ হাত যেন তাকে জাপটে ধরে ফেলল। বাহুবন্দী অর্ধঅচেতন চাঁপির নাকে গেল অতি পরিচিত এক পুরুষের গন্ধ। গন্ধটা চেনে চাঁপি।

– গিন্ধু!

কোনোরকমে এবার নিজেকে সামলে নিল সে। টালমাটাল পায়ে দাঁড়িয়ে রইল গিন্ধুর বাহুবন্ধনে। গিন্ধু চিৎকার করে বলছে, 'বাবু, বাপমরা মেয়েটার দিকে একবার তাকান, বাবু   সৎকারে সাহায্য করেন বাবু –'

চাঁপির যেন সব গোলমাল লাগছে। কী হচ্ছে এখানে? শক্ত হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করতেই গিন্ধু চাপা গলায় গজরে উঠে বলে, 'কাঁদ চাঁপি – কাঁদ – কেন্দে ফ্যাল –। মনে কর তুর বাপ মইরেছে।'

বাপ! চাঁপির ঘোর কেটে গেছে। ভাল করে এবার মৃতদেহটা দেখে। আরে, এতো সেই ভিকিরিটা! প্রতিদিনই যে তার শীর্ণ হাত দুটো মেলে ধরে চাঁপির কাছে 'মা, এট্টু ভাত দিবা?' এই 'মা' ডাকটা চাঁপির কানে ঢেলে দেয় পিতৃস্নেহের পরশ। বাবাকে মনে পড়ে। তার আসল বাপ আজও বেঁচে আছে কি না সে জানে না। ওই মানুষটাও তো তার বাপেরই বয়েসী। চাঁপির চোখ ছল ছল করে। ভেতরটা হু হু করে কেঁদে ওঠে। চাঁপি তা চাপতে পারে না।

চাঁপির এ অবস্থা দেখে গিন্ধু মনে জোর পায়। আরো চেঁচাতে থাকে – 'বাবু – বাবু – বাপ মরা মেয়েটার দিকে তাকান-বাবু –'

টং টং করে পয়সা পড়ে। পাঁচ, দশ, সিকিও পড়তে থাকে দফায় দফায়। চাঁপি মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে ওঠে। একটু পরেই হয়তো ওরা মরাটাকে কোন আঘাটায় টান মেরে ফেলে দেবে কে জানে! চাঁপির ভেতর থেকে মোচড় দিয়ে ওঠা কথাটা – 'ওগো তুমি ওরে সদগতি কোরো' তার গলার কাছে এসে দলা পাকিয়ে যায়। গিন্ধুর জ্বলন্ত দৃষ্টির সামনে সে বোবা হয়ে থাকে। গিন্ধু তা আঁচ করে ধমকে ওঠে,

– 'চুপ হারামজাদী, এমন ফিকির পাবি কুথাও?' □

ছবি : গৌতম দাশগুপ্ত

রাজনীতি

শীতের রাজনীতি, রাজনীতির শীত

রাজনীতির আবার শীত বর্ষা কি রাজনীতি কি মরসুমী ফসল না, তা নয়। তবে শীতে রাজনীতিটা, বিশেষ করে হালের রাজনীতি জমে ভাল। যেমন যাত্রাপালা, উচ্চাংগ সংগীত, আধুনিক গানের জলসা শীতে যতটা জমে, অন্য ঋতুতে ততটা নয়। রাজনীতিও তাই।

আসলে এখন তো আর সেকেলে রাজনীতি নেই। রাজনীতির এখন আধুনিকীকরণ হয়েছে, কম্পিউটারাইজড হয়েছে। আরও খোলসা করে বলতে হয় রাজনীতি আর রাজারাজড়ার একচেটিয়া সম্পত্তি নয়। রাজনীতি আগে ছিল সামন্ততন্ত্রের ছত্রছায়ায়, এখন রাজনীতি জনগণতান্ত্রিক। পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই-এ এখন পুঁজির অভাব নেই। বছর পনেরো আগেও রাজনীতি করতে হলে কাঠখড় না হোক পাটকাঠি পোড়াতে হত। রাজনীতি কখন যে তেতে উঠবে কেউ বুঝে উঠতে পারত না। আর তেতে উঠলে সামাল দেওয়ার দায়ও ছিল। আসলে রাজনীতি মানেই মুভমেন্ট। সরল বাংলায়, আন্দোলন। অনেকে বলেন, না, এখন আর আন্দোলন নেই। আন্দোলন ঠিক জমে না। ভুল ধারণা। এখনও কি বাম আর কি দক্ষিণ সব দলেই মুভমেন্ট চলছে। মুভমেন্ট মানে শুধু আন্দোলন নয়, নড়াচড়া। এখন নড়াচড়া চলছে। তবে আগের মত, সাবেকী ঢং-এ নয়, আধুনিক কায়দায়।

আগে হঠাৎ একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হলেই আপনা থেকেই আন্দোলন শুরু হয়ে যেত। এখনও হয়, তবে সেটা খুচরো গোছের আন্দোলন। পাকাপাকি, বড় রকমের আন্দোলন করতে হলে পাঁজি-পুঁথি দেখতে হয়, ঋতু পছন্দসই হতে হয়। তা না হলে নেতাদের পাওয়া যায় না। আর না পাওয়া গেলে আন্দোলন জমে না। আসলে আন্দোলনের কর্মসূচিও তো বদলে গিয়েছে। এখন আন্দোলন বলতে গেলে বেশ কিছু বিক্ষোভ, সমাবেশ, ধরনা, বারো-চব্বিশ ঘন্টার অবস্থান, মিছিল, পদযাত্রা ইত্যাদি। এসব গরমের সময় হয় না যে তা নয়, তবে সেরকম জমে না।

তাছাড়া আছে কনভেনশন, কনফারেন্স, বার্ষিক সমাবেশ, সাধারণ সভা, শিবির ইত্যাদি। গত দশ বছরের রাজনীতিতে এসব কর্মসূচিই কৌলীন্য লাভ করেছে।
আগে সম্মেলন, শিবির, সাধারণ সভা গরমের সময়ও হত।
এখন সব চলছে শীতের সময়।
আসল ব্যাপারটা হল, শীতের সময় এসব হলে রাজনীতিও হল আবার রাজনীতির নামে রাজকীয় খানাপিনা, একটু বেড়ানো, জমিয়ে আড্ডাও হয়। সারা বছরের একঘেয়ে রাজনীতিতে একটু মুখ পাল্টানোও হল।
আগেকার দিনে বড় বড় জমিদার রাজারা ওস্তাদ গাইয়েদের এনে, বাঈজীদের মোটা রকমের ইনাম দিয়ে

১৯৮৫-র শীতে পার্টি কংগ্রেসে নেতারা



নাচ-গানের আসর বসাতেন। আভিজাত্য জাহির করতে পারতেন। গ্রামের জমিদাররা যাত্রাদল আনাতেন, কবি গানের লড়াই-এর আসর বসাতেন। এ সবই হত শীতকালে। কলকাতায় বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন, সংস্কৃতি মেলা, মুক্ত মেলা, সঙ্গীত সম্মেলন, নাট্য সম্মেলন, সাহিত্য সম্মেলন সবই হত মোটামুটিভাবে শীতকালে। শাল-আলোয়ান মুড়ি দিয়ে সারারাত্রিব্যাপী গানবাজনা শোনার মধ্যে বেশ একটা মেজাজ চলে আসত। এখন পার্টির সম্মেলন, ইউনিয়নের বার্ষিক সম্মেলন গরমের সময় হয় না। ছাত্র, যুব, মহিলা, ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষক ফ্রন্ট, পার্টি – সব ফ্রন্টেরই সম্মেলন, সমাবেশ, কনভেনশন সব কিছুই হয় শীতকালে।



মরশুমি রাজনীতি : মহিলা ডেলিগেট্স

শীত যেই পড়ল সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল সব সম্মেলন। আগে এ সব বাছ বিচার ছিল না। বিশেষ করে যে সব দল ক্ষমতায় যায়নি, ক্ষমতার স্বাদ পায়নি তারা গরম কালেও সম্মেলন করত, আন্দোলনের কর্মসূচি নিত। ব্যাপারটা হল, আগে তো আন্দোলনের কর্মসূচি ছ'মাস আগে থেকে ঠিক হত না। ঠিক হত হঠাৎ, পরিস্থিতি অনুযায়ী। ছাত্র আন্দোলন, কল কারখানায় ধর্মঘট, লাগাতার ধর্মঘট, ঘেরাও, অবস্থান মার্চ এপ্রিল মাসে অনেক হয়েছে। এখন সব কমে গিয়েছে। মাঝে মাঝে হয় তবে একদিনের জন্যে, ক্রিকেটের ওয়ান ডে ম্যাচের মত।

আসলে ব্যাপারটা হল, শীতে রাজনীতি কতটা জমবে তা নয়, মেজাজটা আসে। বেশ এনজয় করা যায়। ভালমন্দ খাওয়া দাওয়া, জমিয়ে খোশ গল্পের মত আলোচনা চালানো যায়। সম্মেলনের কটা দিন বেশ কেটে যায়, বাড়ির বাইরে ছোট-খাট একটা ট্যুরের মত। গরমকালে ভাল মাছও পাওয়া যায় না। তরিতরকারি বলতে আলু আর কুমড়ো। খেয়ে সুখ নেই। অসুখ-বিসুখের ভয়টা লেগেই থাকে। অসুখ-বিসুখ হয়ও। এই তো ১৯৮১ সালের মে মাসে দমদমে সি আই টি ইউ-এর সম্মেলনে বুড়ো বয়সে বি টি রনদিভে চিংড়ি মাছের কারির লোভ ছাড়তে পারেননি। সেই চিংড়ি খেয়ে তো বি টি আর এর অবস্থা কাহিল হয়ে পড়ল, ফুড পয়জন হয়ে গিয়েছিল।

অথচ এই বামপন্থী এবং সি পি আই (এম)-এর লোকেরা ঠা ঠা রোদ্দুরে বার্নপুর থেকে মিছিল করে কলকাতায় জমেছে। পুলিসের সঙ্গে সংগ্রামী জনতা লড়ে গিয়েছে চড়া রোদের মধ্যে। তারও আগে শিক্ষকরা এসপ্ল্যানেড ইস্টে অবস্থান করেছেন, মিছিল করেছেন, বিক্ষোভ করেছেন। সে কাল গিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে এখন প্রায় সব দলই ক্ষমতার স্বাদ পাওয়ার পরই রাস্তা বদল করেছেন। রাজনীতি গরম করতে সস্তায় বাজিমাত করার রাস্তা খোঁজেন। এখন প্রবীণ-নবীন কেউই কষ্ট সহ্য করতে পারেন না। শীতের সময় ঠান্ডায় কষ্ট পেতে হয় পার্টির হাঁপানি, ব্রংকাইটিস রোগী নেতা-কর্মীদের। তবে সেটা সামাল দেওয়া এমন কিছু কষ্টকর নয়।

এই তো সি পি আই (এম)-এর পার্টি কংগ্রেস হয়েছে ১৯৭৮ সালে, গরমের সময়। সালকিয়ায় পার্টি প্লেনামও হয়েছে। বাস ওই পর্যন্ত। তারপর থেকে সব শীতে। গত ১৯৮৫-তে পার্টি কংগ্রেস হল ডিসেম্বর মাসে। শীতটা বেশ জাঁকিয়ে পড়েছিল। কুছ পরোয়া নেই। পার্টির নেতাদের নির্দেশে লেপ-কম্বল এসেছিল। তার সঙ্গে কয়েক লরি খড় এল মেঝেতে পাতার জন্য, মেঝেটা গরম রাখার জন্য। ঢালাও চা কফি, অভিজাত ক্যাটারারের মোগলাইখানা। স্বেচ্ছাসেবক কমরেডদের লাল সোয়েটার দেওয়া হয়েছিল।

তবে শুধু সি পি আই (এম) নয়, সব বামপন্থী দলই এখন শীতের জন্য অপেক্ষা করে। ভাল ভাল বাংলো, সরকারি অতিথিশালা, টুরিস্ট লজ বুক করে নেতা হাফ নেতাদের জন্য। সেই সঙ্গে ভাল মন্দ খানাপিনা। ভাল থাকার জায়গা, ভাল খাওয়া দাওয়া, ভাল আড্ডা, ভাল সাজগোজ শীতে যতটা জমে, গরমে কি আর জমে? তারপর আছে লোডশেডিং। গরমে তো গলদঘর্ম অবস্থা। শীতে অন্তত লোডশেডিং থেকে রেহাই।

এখন তো সব নির্বাচনও টেনে আনা হয়েছে শীতে। শীতে নির্বাচনী কাজও করা যায়, জমেও ভাল। আগে গরমে নির্বাচন হত, তখন কিন্তু এত আপত্তি ছিল না। এখন নির্বাচন শীতের সময় করার জন্য রীতিমত আন্দোলন হয়। অবশ্য আন্দোলন বলতে দেওয়াল লেখা, মিটিং, কনভেনশন আর খুব বেশি হলে বন্ধ। এখন আর লাগাতার বলে তেমন কিছু নেই।

গরম রাজনীতি এখন সারা বছরের জন্য নয়। মরশুমি রাজনীতি চলছে। রাজনীতি বিলাসী হয়ে পড়েছে। শীতের রাজনীতি এখন রাজনীতিরও শীত। □

নিশীথ দে



কার্তিক থেকে পৌষ মেয়েলি ব্রতপার্বণ

কথায় বলে বাঙালির বারো মাসে তের পার্বণ। শুধু কথার কথা নয় ভীষণভাবে সত্যি। জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে এ পার্বণ যেন এক শৃংখলিত নিয়ম মানার অমোঘ বিধানে সংসার জীবনকে সংযমী ও শ্বাশত সুন্দরের আহ্বান জানিয়েছে, যদিও বিতর্কের ঝড় ওঠে আজকের দিনে। প্রগতির হাওয়ায় বুঝি বাদ সাধে এই সব পুজো পার্বণ ব্রতকথার।

গ্রামবাংলার মেয়েরা ছোট বয়স থেকেই বিভিন্ন পুজো-আচা-ব্রত-উপোস করে থাকে। উদ্দেশ্য ভবিষ্যৎ সংসার জীবনকে সুখী করা। ঈশ্বরের সংগে যেন নিবিড় সখ্য গড়ে তোলা। প্রতি মাসেই কোনো না কোনো পুজোর মন্ত্রকে ঘিরে স্মরণের দীপ জ্বালিয়ে বারো মাসের পার্বণের ব্যাখায় না গিয়েও আমরা যদি কার্তিক থেকে পৌষ এই তিন মাসের পুজো পার্বণ অর্থাৎ হেমন্ত ও শীতের কথা জানতে বসি তবে তাও কিছু কম জানা হবে না, বরং আপাত বিস্ময় অতি আধুনিক মনকেও ভাবতে বসাবে।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিষ্ণুপুর থানা এলাকার রামকৃষ্ণপুর গ্রামে যখন জানতে চাইলাম ওরা এই মাসগুলোতে কি কি পুজো পার্বণ পালন করে থাকে, তখন কিশোরী পুঁটি, ফুচি, টুকি, বনি, মীনু ও তারাপিসি, মংগলাপিসি হেসেই খুন। আবার যখন জানল তা কাগজের জন্য এবং ছবিও উঠবে তখন সবার চোখই বড় বড় হয়ে উঠল নিষ্পাপ সরল সুন্দর বিস্ময়ে। ঠাকুরের উদ্দেশে কপালে হাত ঠেকিয়ে ওরা সকলে বলতে বসল। নেত্রীর ভূমিকা নিলেন বাল্যবিধবা তারাবালা রায়। সকলের সর্বজনীন পিসি। এটা তাঁর বাপের বাড়ির দেশ। এ গাঁয়ের মেয়ে বউ যেই কোনো ব্রত বা পুজো করুক না কেন তারাপিসি ছাড়া চলবে না। সেই তারাপিসি শুরু করলেন :

১। কুলকুলতি পুজো : আশ্বিন মাসের সংক্রান্তি থেকে গোটা কার্তিক মাস ধরে হয় এই কুলকুলতি পুজো। কার্তিক সংক্রান্তিতে এই পুজো শেষ হয়। এই পুজো বা ব্রত করতে কোনো পয়সা খরচ করতে হয় না। অন্তরে ভক্তি চাই নিয়ম মেনে নিষ্ঠা সহকারে পুজো করে। উপোস করতেও হয় না। প্রতিদিন সন্ধে বেলা গা কাপড় ধুয়ে তুলসী তলায় প্রদীপ জ্বেলে এ পুজোয় বসতে হয় উপকরণ ১২টা কুলপাতা, ১২টা দূর্বা ও কিছু ফুল। আর রোজ দুটো করে মাটির নতুন প্রদীপ জ্বালা সঃ তেল দিয়ে। এক মাসে মোট ৬০টা প্রদীপ করতে হয়। কেউ একসংগে বানিয়ে রাখে, কেউ বা রোজ দুটো করে গড়ে নেয়, যার যেমন সুবিধে।

তুলসীতলা ভাল করে লেপে দুটো প্রদীপের তলায় তিনটে করে কুলপাতা ও তিনটে করে দূর্বা দিতে হবে। এবার সঃ তেল দিয়ে প্রদীপ জ্বালতে হবে। একটা ঘটি লাগে, না পেলে গেলাসেও চলে। সেই ঘটি জল ভরে বসাবে তিনটে কুলপাতা ও তিনটে দূর্বার উপরে। ৯টা কুলপাতা হয়ে গেল। এবার বাকি তিনটে কুলপাতা তিনবার মন্ত্র বলার সময় জল ঢালার সময় (তুলসী গাছের গোড়ায় ঢালবে) দেবে। সংগে দূর্বা ও ফুল। এবারে আসি মন্ত্রের কথায়। সন্ধে বেলা গা ধুয়ে যখন ঘটি ডুবিয়ে পুকুর থেকে জল তুলবে তখন তিনবার বলতে হবে

জল শুদ্ধ তল শুদ্ধ
শুদ্ধ অহংকায়া
পৃথিবীর তিন কোণ
কৃষ্ণের ছায়া।।
এবারে প্রদীপগুলো জ্বালার সময়
তিনবার বলতে হবে –
গা তোল গা তোল হরি
তোমার মন্দিরে সন্ধ্যা করি।।
এবারে ঘটের জল ঢালতে হবে তুলসীর গোড়ায়। তিনবার ঢালবে এবং তিনবারই বলবে –
তুলসী তুলসী নারায়ণ
তুমি তুলসী বৃন্দাবন
তোমার শিরে ঢালি জল
অন্তিমকালে দিও স্থল।।
এরপর তিনবার ফুল দূর্বা দেবার সময় তিনবারই বলতে হবে –
কুলকুলতি কুলবতী
এ জন্মে দিলাম বাতি
আর জন্মে হব আমি লক্ষ্মী সরস্বতী
বাপকুল-মাতুলকুল-শ্বশুরকুল
তিন কুল উজ্জ্বল হোক।
এবারে প্রদীপ দিয়ে তুলসীকে তিনবার আরতি করার সময় তিনবারই বলবে –
সন্ধে সন্ধে পবন বাতি
সন্ধ্যে দেখাও সরস্বতী
শাঁখ বাজাও মা শঙ্খধ্বনি
পূজো করো মা রাজরানী
যত আছো দেবগণ
সন্ধে নাও নারায়ণ।
পূজো শেষ। নমস্কার করার সময় তিনবার বলতে হবে –
তুলসী তুলসী মাধবীলতা
কও তুলসী কেষ্ট কথা
কেষ্ট কথা শুনলাম কানে
দ্বাদশ কোটি প্রণাম হরির চরণে।।
এক মাস প্রতি সন্ধ্যায় এইভাবে মন্ত্র বলে পূজো চলবে। কুলকুলতি তুলসী-স্বরূপা লক্ষ্মী। সকলের কল্যাণই তাঁর কামনা। অঘ্রাণের পয়লা তারিখে এক মাসের জমা প্রদীপ দূর্বা কুলপাতা সব কুলোয় করে নিয়ে যে এতদিন পূজো করেছে সেই মাথায় করে নেবে। তারপরই ওই কুলো মাথায় পুকুরে ডুব দিয়ে উঠে জলে ভাসিয়ে দেবে সবকিছু এবং তিনবার বলবে –
কুলকুলতি ভাসে
সাত ভাই হাসে
সোনার নাড়ু কুড়িয়ে পেলুম
সাত ভাইয়ের হাতে দিলুম।।
জল থেকে উঠে ভিজে কাপড়েই পুকুর



কুলকুলতি পূজো তুলসীতলায়

পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা সাতটি বাচ্চা ছেলেকে (সম্পর্কে ভাই) নারকেল নাড়ু হাতে দিতে হয়। ওইদিন পারলে তুলসী তলায় ফলপ্রসাদ দিয়েও পূজো দেওয়া যায়। প্রচলিত প্রবাদ যে মেয়ে শিশু বয়স থেকে এ পূজো করে এবং প্রতি সন্ধ্যায় তুলসী তলায় জল দেয় ও প্রদীপ দেখায় তার জীবনে কখনো অকাল বৈধব্য আসে না। স্বামী সোহাগিনী হয় এবং বাপের বাড়ি শ্বশুরবাড়ি ও প্রতিবেশীর কাছে লক্ষ্মী কল্যাণময়ী নারী বলে পরিচিত হবার সৌভাগ্য লাভ করে।

২। কার্তিক মাসে কালীপূজোর রাত্রে হয় অলক্ষ্মী পূজো। এই পূজোর নিয়ম অমাবস্যা যেদিন পড়ে সেদিন সন্ধেবেলা করা। যদি কালীপূজোর দিন রাত্রে অমাবস্যা লাগে তবে পরের দিন সন্ধেবেলা হয়ে থাকে। নিয়ম উপোস করতে হয় না। সন্ধ্যেবেলা গা কাপড় ধুয়ে বাড়ির একজন যায় ঘরে সন্ধে দিতে – আর একজন যায় অলক্ষ্মী বিদায় করতে। অলক্ষ্মী বিদায় হয় একটা কলা গাছের খোল কেটে নৌকো মত করা হয়। সেই নৌকোতে এঁড়ে গরুর গোবরের তিনটে পুতুল গড়তে হয়। একটা লোক, একটা বউ, একটা বাচ্চা এই তিন পুতুল। গোবরের বউ পুতুলের মাথায় দিতে হয় সিঁদুর। চোখ করতে হয় কাপাস তুলোর দানা দিয়ে। অনেকে কড়ি দিয়েও করে। নৌকোর মধ্যে একটা মাটির প্রদীপ জ্বালাতে হয় সরষের তেল দিয়ে। একটা মোমবাতিও বসাতে হয়।

এরপর বাড়ির ছেলেপুলেদের নিয়ে একটা আঁখ দিয়ে পুরনো কুলো বাজাতে বাজাতে এক গুচ্ছ প্যাকাটি ধরিয়ে ওই নৌকোটা সন্ধের অন্ধকারে তে'মাথার (তিন রাস্তার মুখে) মোড়ে বসিয়ে দিতে হবে এবং তিনবার বলতে হবে
অলক্ষ্মী দূর হও
ঘরের লক্ষ্মী ঘরে আও।।
অলক্ষ্মী বলা হয় বাড়ির মেয়েদের উদ্দেশে। আর ঘরের লক্ষ্মী বলা হয় ভাবী বউয়ের উদ্দেশে। মনে করা হয় ঘরের মেয়ে যতই লক্ষ্মী হয়ে গড়ে উঠুক না সে তো পরের জন্য। বরং এমনই এক লক্ষ্মী আসুক আমাদের ঘরে বউ হয়ে। বাপের দেশে খেদিয়ে ভাঙা কুলো বাজিয়ে বিদেয় হলেও কোন এক ঘরে তো সে বরণ হচ্ছে লক্ষ্মী বলে।
এরপর একটা রেকাবি নিয়ে বামুন বাড়ি যেতে হবে। রেকাবি আগেই সাজানো থাকবে। রেকাবিতে থাকবে এঁড়ে গরুর গোবরের তিনটি পুতুল বাপ মা ছেলে। নারকেল নাড়ু, আঁখ টিকলি, কাঁচা সুপুরি, কাঁচা তেতুল, কাপাসতুলোর দানা, মেয়েদের মাথার ছেঁড়া চুল, শালুকের মূল, ঘোর কচুর মূল, গোবরের বউ পুতুলের মাথায় সিঁদুর। ওই রেকাব পূজো হলে ঘরে এনে রাখবে। অলক্ষ্মী পূজো শেষ।
এবারে হবে ওই দিনই সুখ পূজো একটা রেকাবিতে রাখা হবে আতপচাল



কলাগাছের খোলের মধ্যে গোবরের অলক্ষ্মী

ভিজিয়ে বেটে আঁখ টিকলি করা, এক ছড়া কাঁচা কাঁঠালি কলা, একটা পাকা কলা, কাঁচা সুপুরি, কাঁচা তেঁতুল, ঘোর কচুর মূল, শালুকের মূল, নারকেল নাড়ু একটা। এবার আরো একটা রেকাবি নিতে হবে বামুনবাড়ি পুজোর জন্য। বামুন বাড়িতে বামুন ওই রেকাবিতে 'সুখ' গড়ে দেবে চালবাটা দিয়ে (অনেক সময় বাড়ির মেয়েরাও গড়ে দেয়)। একটা চালের বড় মন্ড হবে। তার পাঁচটা মুখ হবে প্রদীপের মত। আবার আরো একটা ছোট মন্ড হবে ওর পাশে তার থাকবে দুটো মুখ প্রদীপের মত। দুটো মন্ডের এই সাতটা মুখ সঃ তেলের সাহায্যে প্রদীপ হয়ে জ্বলবে। এবার ওই রেকাবিতেই তিনটে চালবাটার গোলা ঘর তৈরি হবে। তার একটাতে থাকবে ধান, একটাতে সর্ষে, একটাতে কড়াই। বামুন ওই রেকাব জ্বালিয়ে নারায়ণ শিলার সামনে আরতি করে পুজো করে বাড়ির বউয়ের হাতে তুলে দেবে। বউ বাড়িতে এসে সেটা ঘরে রাখবে। খুব ভোরে উঠে একটু জল দিয়ে উঠোনের মাঝখানটা লেপে ওই 'সুখগড়' রেকাবটা রাখবে প্রদীপ জ্বালিয়ে। একটা নারকেল নাড়ু, একটা পাকা কলাও রাখবে। এক ঘটি জলও থাকবে। এরপর সুখতারার দিকে তাকিয়ে ঐ রেকাব প্রদীপ ধরে প্রণাম করে বলবে সুখে রাখ সবাইকে। বাড়ির বউই সুখ হয়ে ওই রেকাব নিয়ে উঠোন ঘুরবে। তারপরই ওই প্রদীপের তাপ-এর ছোঁয়া বাড়ির প্রত্যেকের মাথায় এমন কি গৃহপালিত পশুদের মাথায়ও দেবে। ওই রেকাব প্রদীপ গোয়াল ঘরও ঘুরে আসবে। 'সুখ পুজোর' উদ্দেশ্য সবাইকে সুখী রাখা।

৩। ইতু পুজো : কার্তিক সংক্রান্তির দিনে ইতুলক্ষ্মী তুলতে হয়। গোটা অঘ্রাণ মাস ধরে এ পুজো চলে। অঘ্রাণের সংক্রান্তিতে পুজো ওঠে। প্রতিদিন শুধু জল ঢালতে হয় ইতুর ঘটে। এছাড়াও ওই অঘ্রাণ মাসের প্রতি রবি ও বৃহস্পতিবার উপোস করে পুজো দিতে হয় যার যেমন সাধ্য তেমন ফলমূল দিয়ে।

ইতু ঠাকুর তোলার নিয়ম : একটা মাটির সরাতে মাটি ভর্তি করতে হয়। ভরা মাটির উপর দুটো ছোট খুরির উপর দুটো মাটির ঘট বসাতে হয়। ঘটের উপর আমসর দিতে হয়। ঘটের গায়ে দিতে হয় সিঁদুর। সরার মাটিতে ছড়িয়ে দিতে হবে পাঁচকলাই, যব, সর্ষে ও ধান। এছাড়াও ওই মাটিতে বসাতে হবে ছোট কলাগাছের চারা একটা, মানকচুর গাছ একটা, কালো কচু গাছ একটা, ধানগাছ একটা, কলমি শাকের একটা ডাল, হিংচে শাকের একটা ডাল, শুসনি শাকের একটা গাছ। ইতুর ঘটে যে রোজ জল ঢালা হবে মন্ত্র পড়ে, সেই সেই জল পেয়ে সরাতে ফেলা দানা থেকে সবরকম গাছ গজিয়ে উঠবে। যার গাছ যত বাড়ে তার নাকি তত উন্নতি হয় ইতুর বরে এ প্রবাদও প্রচলিত।

ইতু পুজোর মন্ত্র : ইতুর ঘটে জল ঢালার সময় তিনবার করে বলতে হয় –

এব জল দেব জল
  এনেছি ভীমরাজের পানি
এই জলে চান করো মা
  আজ দুর্গা রানী।।

ঘটে জল দেবার সময় তিনবার বলতে হবে –

হিংচে কলমী লক লক করে
  রাজার ব্যাটা পক্ষ মারে
মারলুম পক্ষ সুখের বিল
  সোনার কৌটো রুপোর খিল
আজ কেন রাই এত বেলা
  হাসতে খেলতে সোনার
    দোলায় দুলতে
পাটের শাড়ি পরতে
  অন্ধের চক্ষু দিতে
ওর ফুল জোড় কলা
  রক্ত চন্দন জবার মালা।।

ইতুকে নমস্কার করতে পুজো শেষে তিনবার বলতে হবে –

নমোঃ নমোঃ নমোঃ দুর্গা নমোঃ নারায়ণী
কাতরে কর্ম দয়া তব গুজানি
তুমি দিবা তুমি সন্ধ্যা তুমি গো যামিনী
কখনো পুরুষও মা কখনো কামিনী
সত্য যুগে সতী নামা সত্য সনাতনী
ত্রেতা যুগে ত্রিপদ মাগো ত্রিলোক বাসিনী
যশোদা পূজিয়া ছিল ক্ষীরোদের কূলে
ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে কৃষ্ণ নিলেন
  কোলে।।

একমাস এইভাবে ইতু পুজো করার পর অঘ্রাণ সংক্রান্তির দিনে সামর্থ্য অনুযায়ী নানারকম ফল-মঠ-তিলের নাড়ু-তিলে খাজা-গজা-পিঠে-পায়েস-মোয়া (অনেকে লুচি ভাজা-ভুজিও করে) সব দিয়ে পুজো দেওয়া হয়। ফলমূল ও রেকাবে নৈবেদ্য সাজিয়ে দিতে হয়। ওইদিন তিনবার পুজো হয়। সকালে একবার, দুপুরে একবার ও সন্ধেয় একবার। দুপুরের পুজোটা করার পর উপোস ভাঙতে হয় দুধ-চিড়ে-মুড়কি প্রসাদ খেয়ে। সন্ধেবেলা সব উপাচার থাকলেও অবশ্যই দিতে হবে আঁকশি পিঠে-দুধ ও নতুন গুড়। পুজো হয়ে গেলে ইতুর সরা ঘট মাথায় নিয়ে কাঁসর-ঘন্টা-শাঁখ বাজিয়ে ইতুকে ভাসান দিতে হবে পুকুরে। ইতু লক্ষ্মীর বরে কুমারী মেয়ে পায় সুন্দর বর ও ঘর। আর এয়োতি লাভ করে স্বামীর সোহাগ সুপুত্র ও গৃহের সর্বাঙ্গীন উন্নতি।

৪। পায়েসের বার : অঘ্রাণ মাসের যেকোনো দিনে শুক্লপক্ষ দেখে (আকাশে সেদিন চাঁদকে দেখতেই হবে। ঈদের

চাঁদ দেখার মত) সারাদিন উপোস করে গাঁয়ের বটতলায় পঞ্চানন্দ-বিবিমায়ের থানে পুজো দিতে হবে ফলমূল কলা ও নতুন ধানের আতপ চাল দিয়ে। পুজো করবে বামুন। উপোস ভাঙে সন্ধের পর। পঞ্চানন বিবিমায়ের থানের মাঠে সারা মাঠ জুড়ে ওইদিন উনুন খোঁড়া হয়। ওই উনুনে নতুন ধানের আতপচালের পায়েস রান্না হবে নতুন গুড় ও দুধ দিয়ে নতুন হাঁড়ি করে। উনুনে জ্বাল দেওয়া হবে নারকেল পাতা ও প্যাকাটি দিয়ে। পায়েস রান্না হয়ে গেলে প্রথম তা হাঁড়ি থেকে তুলে কলাপাতার ডগায় বাড়তে হবে। ঐ পায়েস যে উপোস করে রেঁধেছে সেই আগে খাবে। তারপর ঐ পায়েস প্রসাদ হিসাবে সবাইকে বিলিয়ে দেওয়া হবে। এই পায়েসের বার না করলে নতুন চালের পিঠে পায়েস কিছুই করে খাওয়া শুরু করা নাকি যায় না। এছাড়াও অঘ্রাণ মাসের সংক্রান্তির দিনে নতুন ধানের আতপচাল ভিজিয়ে জল ঝেড়ে শুকনো করে বেটে গুঁড়ি হাত করতে হয় এবং বলতে হয় 'অঘ্রাণে গুঁড়ি হাত পরের সংক্রান্তে পিঠে ভাত।।'

৫। পৌষ পার্বণ – গৃহস্থের বাড়ির যেকোন জায়গায় ভাল করে গোবর লেপে পরিষ্কার করে নতুন ধান ঢেলে তার চারি ধারটা নতুন ধানের আতপচাল ভিজিয়ে বেটে আলপনা দিয়ে গোল করে দিতে হবে। তারপরে তার পাশেই আলপনার মধ্যে দিয়ে আঁকতে হবে গরু, গোলা, ঢেঁকি, কুলো, লাঙল, জোল, মই, কাস্তে, মানুষ বয়ে নিয়ে যাচ্ছে এমন করে আঁকা পালকি, পেতলের ঘটি, চালনা, ধানের শিস, লক্ষ্মীর পায়ের ছাপ। বিভিন্ন ফলপ্রসাদ নৈবেদ্য ওখানেই সাজিয়ে দিতে হবে এবং বামুন আসবে ও পুজো করবে। আর ওই ঢালা ধানের উপর 'বাওনি' বাঁধতে হবে। 'বাওনি' বাঁধা হবে আমপাতা তিনটে ধানের শিষ-চালবাটা গুঁড়ি ও ফুল। এই বিনুনিটা বেশ মোটা করে ধানের উপর শুইয়ে দিতে হবে। তারপর এমনি করে আরো অনেকগুলি 'বাওনি' বেঁধে প্রতি ঘরের দরজায়-গোলায়-চালের-কড়াই-এর হাঁড়িতে রাখতে হবে। এসবই হবে পৌষ সংক্রান্তি দিনে। এর পরের দিন খুব সকালে ওই জায়গাতেই মা লক্ষ্মীর উদ্দেশে আয়না-চিরুনি ও একটা আমপাতায় খানিকটা নুন একটা খড়কে



কুলো বাজিয়ে অলক্ষ্মী বিদায়

কাঠি ও এক গেলাস জল রাখতে হবে। উদ্দেশ্য মা লক্ষ্মী ঘুম থেকে উঠে যেন দাঁত মেজে মুখ ধুয়ে মাথা আঁচড়াতে পারে। আক্ষিণের দিনে বামুন বাড়িতেও নারায়ণ শিলার কাছে পুজো পাঠানো হয় এবং ওইদিন অনেকেই ভালমন্দ খেয়ে থাকে। পৌষ সংক্রান্তির আগের দিন, পৌষ সংক্রান্তির দিন ও আক্ষিণের দিন এই তিনদিনই চলে প্রতি বাড়িতে পার্বণের মহোৎসব পিঠে পায়েসকে সঙ্গী করে। এবং এই তিনদিন পিঠে করার সঙ্গে সঙ্গে এই দিনগুলোর উদ্দেশে বাড়ির মেয়ে বউরা ছড়া কেটে বলে থাকে –

আওনি বাওনি তিনদিন যেন না কোথাও যেও
ঘরে বসে সবাই মিলে পিঠে-ভাত খেও।।

৬। পৌষ সংক্রান্তি : আক্ষিণ বাওনি বাধা পিঠে খাওয়া এসব কেটে গেলে আসে মাঘ মাস। মাঘ মাসের দু তারিখে হয় আবার, 'সোদো ভাসানো'। গাঁয়ের ছোট ছোট মেয়েরা ভাইয়ের মঙ্গল কামনায় এটা করে থাকে। কলাগাছের খোল কেটে একটা বড় নৌকো করা হয়। এছাড়াও কলার খোল দিয়েই অনেকগুলি ছোট ছোট খোল তৈরি করা হয়। এবারে ওই প্রতিটি খোলের মধ্যে জোড়া (দুটো করে) জোড়া জিনিস দিয়ে ও খোলগুলি নৌকোর মধ্যে পর পর সাজানো হয়। খোলে থাকে যেমন – এক জোড়া সিম, এক জোড়া কলা, এক জোড়া কুল, এক জোড়া হলুদ, এক জোড়া কড়ি, একটুকরো কাপড়ে সঃ তেল ও হলুদ মাখানো, একটা তীর কাঠি, ও তীর ধনুক এসব দিয়ে একটা প্রদীপ জেলে দিতে হবে। সারাদিন উপোসের পর সন্ধেবেলা গা-কাপড় ধুয়ে পুকুরের জলে ওই কলাগাছের খোলের নৌকো ভাসাতে গিয়ে মন্ত্র বলতে হবে ছড়া কেটে

সোদো খোলায়
        আমার ভাই দোলায়
সোদো পথে
        আমার ভাই রথে
সোদো ভাসে
        আমার ভাই হাসে।।

অমঙ্গলকে বিদায় জানিয়ে মঙ্গলকে আহ্বান করে ছোট বোন ভাইয়ের কল্যাণে ভাইয়ের সুখ চায়। 'সোদো ভাসানোর' এই ব্রতের কথা জানা গেল বাঁকড়া পাথরবেড়িয়ার দেউলপুরের জবা পরামাণিকের কাছে।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার গ্রামগুলোতে ঘুরলে এমন অনেক ব্রতর কথা জানা যায়। কিশোরী মেয়েরা এসব করতে বেশ ভালই বাসে। ওদের চোখেমুখে থাকে উৎসবের আনন্দ। 'বার' করা তো পুজোর কাজ। এখানে যে কটি ব্রত ও নিয়মের কথা তুলে ধরলাম তা মাহিষ্য সম্প্রদায়ের। ধর্ম-ভক্তি সবই খুঁজে পাওয়া গেল তবুও যখন দেখলাম তারাপিসি ও মঙ্গলাপিসির সিঁথি ধবধবে সাদা – তখন মনে হল কুলকুলতি, ইতু তোমরা কি সত্যি আছো? □

চন্দ্রা মিত্র

ফটো : প্রীতিকুমার সরকার

শীতের আউটডোর : মজা এবং ঝামেলা

খুব কম বাঙালি আছেন যিনি শীত নামার খবরে অখুশি হন। আমাদের গরম দেশে শীতের খবর তো আরামের হবেই। ছোটবেলা থেকেই শুনে আসছি – 'শীতে বাপু খেয়ে শান্তি, শুয়ে সুখ।' শীত মানেই নানান প্রিয় খাবার – বেগুনপোড়া, ধনেপাতা, নলেন গুড়, কমলালেবু, নতুন আলু, পেঁয়াজকলি, আরও কত কী! শীত মানেই নানা রঙের নানা রকম গরম পোশাক। ট্রামে-বাসে, মেট্রো রেলে মেয়েদের হাতে হাতে নানা রঙের উল, কাঁটা আর আঙুলের জটিল ছন্দে ঘুরে ঘুরে ফিরে আসে। অনেক মহিলা প্রয়োজনে নয় শুধু অভ্যেসে বা শখেও উল বোনেন। এক্ষুনি একটা ঘটনা মনে পড়ছে। এক ক্যামেরাম্যান – যিনি যথেষ্ট নামী, একবার হাওড়া স্টেশনে এসেছেন। প্ল্যাটফর্মে তখনও গাড়ি আসেনি। দু-পাঁচজন এদিক-ওদিক। ভিড়টা বেশি রিজার্ভেশন লিস্টের কাছে। উনি দেখেন একটা বেঞ্চে এক ভদ্রমহিলা বসে, সামনে দু-একটা লাগেজ। পাশে অনেকটা ফাঁকা জায়গা আছে। কাজেই কাঁধের ব্যাগটা সেখানে রেখে বসতে গিয়েই দেখেন ভদ্রমহিলার কোলে একটা বেশ বড় ধরনের জটিল বিদেশি আধুনিক ক্যালকুলেটর। স্বাভাবিকভাবেই জিনিসটা হাতে নিয়ে পরখ করার ইচ্ছে হল তাঁর। একটু দ্বিধায় ভদ্রমহিলার দিকে চাইতে উনি দেখলেন যে, ভদ্রমহিলা নিবিড়চোখে ওনার সোয়েটারের ডিজাইনটা দেখছেন আর মনে মনে কি যেন গুনছেন। বাস, এবার ক্যামেরাম্যান ভদ্রলোক নির্দ্বিধায় হাত বাড়িয়ে বললেন –

– আপনার ক্যালকুলেটরটা একটু দেখতে পারি?

– নিশ্চয়ই!

– আপনি ততক্ষণ আমার সোয়েটারের ডিজাইনটা দেখুন।

না, না, গল্প নয় একদম সত্যি। তা সে যাই হোক, শীতকালটা আমাদের খুব আদরের। শীতের শুটিং নিয়ে আসলে লেখার কথা, অথচ শুরুটাই কেমন এদিক ওদিক হয়ে গেল। তা যাকগে। সিনেমাতেও ওরকম হয়। শুটিং-এ তো হয়ই। হিন্দি ছবিতে দেখেন না – কাশ্মীরের হু হু শীতেও নায়িকারা কেমন 'ফিনলে'র ধুতির মত ফিনফিনে শাড়ি উড়িয়ে নেচে নেচে গান গায়। বাংলা ছবিতেও পাবেন। বহু শুটিং করেছেন, দেখেছেন এমন একজনকে জিগ্যেস করেছিলাম – আচ্ছা, এইরকম শট নিতে নায়িকাদের তো খুব কষ্ট হয়। উনি নৃপতি চ্যাটার্জির ভঙ্গিতে ফিক্ করে ঠোঁটের কোণে হেসে বললেন, – ধ্যাস্ ও তো ডামি। নায়িকা তো শুধু ক্লোজ-আপে। দেখেননি সে গাছ জড়িয়ে, কাকের মত ঘাড় বেঁকিয়ে পায়ের কাছে পড়ে থাকা নায়কের দিকে দুষ্টু চোখে তাকায় – কাট, তারপর লঙ শটে আবার ডামি।

যাঃ এরকম হয়!

শুটিং তো সারা বছরই হয়। তবে



শীতকালে শুটিং বেশি হয়। তার আসল কারণ শীতে আবহাওয়া থাকে পরিষ্কার। আউটডোর শুটিং করার পক্ষে শীতকাল আইডিয়াল। অবশ্য যদি ছবিতে বিশেষভাবে অন্য কোনো ঋতুর উল্লেখ করার প্রয়োজন না থাকে। যেমন ধরুন – ক্ষেতভরা কচি ধান, অঝোর বর্ষায় অফিস ফেরত কাকভেজা মানুষের ভিড় ইত্যাদি। তবে একটা কথা চুপি চুপি আপনাদের জানিয়ে রাখছি অধিকাংশ পরিচালকই ঋতু-ফিতু নিয়ে মোটেই মাথা ঘামান না। আপনারাও একটু নজর করে ছবি দেখলে বুঝতে পারবেন। এই তো একটু আগে টি ভি-তে 'যুগলবন্দী' না কি যেন একটা সিরিয়াল হচ্ছিল। তাতে গিরিশ কারনাড একটা পাতলা ডোরাকাটা গেঞ্জি গায়ে। সঙ্গের মহিলার পরনেও পাতলা সুতির মিডি। কিন্তু সঙ্গী ভদ্রলোকটির শার্টের ওপর ফুলহাতা গরম জ্যাকেট। কিস্যু বলার নেই। জানতে চাইলেও যুক্তির অভাব নেই।

শীতে ইনডোর শুটিং-এর থেকে আউটডোর শুটিং-এই নানান কান্ড হয়। বিহারের পাহাড়ী ঠান্ডায় রাত্তিরবেলা কোনো অভিনেতাকে তিনঘন্টা ধরে খালি গায়ে শুটিং করতে হল। ব্যস্‌, পরের দিন কাজ বন্ধ। অনেক যত্নে থাকা সত্ত্বেও একবার এক নায়িকার গিরিডিতে শুটিং করতে গিয়ে দ্বিতীয় দিনেই এমন ঠোঁট ফাটল, যে নিরুপায় পরিচালকমশাই তল্পিতল্পা নিয়ে কলকাতায় ব্যাক। শীতের আউটডোরে আর এক কান্ড হয় ইউনিটের সকালবেলার গরমজল নিয়ে। ও কেন পেল আমি কেন পেলাম না এই নিয়ে গোঁসা। অনেকে অবশ্য গরম জলের পরোয়া করেন না। মেক-আপ ম্যান বুনোদাকে দেখেছি শিমূলতলার কনকনে ঠান্ডায় কাকভোরে তেল মেখে হিম কুয়োর জলে হাপুস চান করতে। অনেক অভিনেতাকে আবার সারাদিন শুটিং করে সন্ধের পরে চান করতে হয় মেক-আপ তোলার জন্য। যত যাই হোক শীতের আউটডোরের মজাই আলাদা। সারাদিন কাজ করার পর ক্যাম্পে ফিরে চা নিয়ে চাদর জড়িয়ে আড্ডার স্বাদ বহুকাল মনে থাকে। ইনডোরেও শীতে কাজ করতে সুবিধে অনেক। আসলে গরমে সবারই মেজাজ থাকে খিঁচড়ে। পান থেকে চুন খসলেই লেগে গেল – 'নারদ-নারদ'।

এই কিছুদিন আগে, মানে গত শীতেই একটা ছবির আউটডোরে সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত কালী ব্যানার্জি একটা পাতলা ছেঁড়া পাঞ্জাবি পরে শুটিং করলেন। কিন্তু কাজ শেষ করে ট্যুরিস্ট বাংলোয় ফিরে দুনিয়ার গরম জামা গায়ে চাপিয়ে ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়ালেন। এমনকি মুখ মাথা জড়ানো বাঁদুরে টুপি আর হাঁটু পর্যন্ত উলের মোজা সুদ্ধু ছিল।

নেতারহাটের হিম ঠান্ডায় এক অভিনেত্রীর খুব করুণ অবস্থা দেখেছিলাম। নাইট শুটিং শুরু হয়েছে আটটা নাগাদ। নায়িকা বেচারির কাছে শুধু একটা ছোট শাল। কিন্তু শট দেবার সময় সেটাও গায়ে রাখা যাচ্ছিল না। শট শেষ করেই পাশের একটা কুঁড়ে ঘরের দাওয়ায় সে গুটিসুটি বসে ঠকঠক করে কাঁপছে। তাই দেখে শুটিং দর্শক এক দেহাতি মহিলা ঘর থেকে একটা বোঁটকা গন্ধময় 'সন্ন্যাসী কম্বল' নিয়ে এলেন। লজ্জা ঘেন্নার মাথা খেয়ে সেই কম্বলই জড়িয়ে নায়িকার মুখে লাখ টাকার হাসি। এরকম কত কী ঘটে শীতের শুটিং-এ। সব লিখতে গেলে আঙুলের খিল খুলে যাবে।

বিখ্যাত এক মহিলা পরিচালক শুটিং করছেন আউটডোরে। ক্যামেরায় চোখ রেখে দেখে নিচ্ছেন ফ্রেমিং তাঁর মনোমত হয়েছে কি না, একটু পরে শীত শীত লাগতে চাদরটা চাইলেন। শুটিং জোনের বাইরে একটা চেয়ারে চাদরটা ছিল। কিন্তু আনতে বললেন কাছাকাছি থাকা প্রধান সহকারীকেই। ব্যস্‌, সহকারীমশাই-এর সম্মানে লাঠির ঘা – 'এটা তো আমার কাজ নয় প্রোডাকশন বয়-এর কাজ।' কথাটা ঠিকই, কিন্তু রাগটা মহিলা পরিচালক বলেই কি না কে জানে! হু হু শীতে সারারাত ধরে মাঠে জঙ্গলে শুটিং করার সময় প্রডাকশনের ছেলেরা, লাইটের লোকজন বা ক্যামেরার লোকজন যেভাবে শীত উপেক্ষা করে কাজ করেন দেখলে সত্যিই কষ্ট হয়। অথচ এঁরা টাকাও পান সবচেয়ে কম। প্রয়োজনীয় গরমজামাটাও অনেকের জোটে না সংসারের চাপে।

অবশ্য শীতের অত্যাচার অনেক অভিনেতা-অভিনেত্রীকেও সহ্য করতে হয় নির্মম পরিচালকের পাল্লায় পড়লে। সন্ধ্যা রায়কে ফোন করে যে কেউ জেনে নিতে পারেন 'অশনি-সংকেত' ছবির আউটডোরে সত্যজিৎবাবু কেমন করে শীতের রাত্তিরে ওনাকে পুকুরে চুবিয়েছিলেন।

দু-এক বছর আগের কথা, টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওর ভেতরে খোলা জায়গায় বেশ বড় একটা চাতাল তৈরি করা হয়েছে। তিনপাশে হাঁটু-সমান উঁচু পাঁচিল গেঁথে ভেতরে জল ঢালা হয়েছে। কচুরিপানা, বাঁশ-খড়ের টুকরো-টাকরা ভাসিয়ে বানভাসি গ্রামের একমাত্র পাকা বাড়ির সামনেটা তৈরি করা হয়েছে। একদিকে দু-তিনটে সিঁড়ির পর একটা বিশাল কোলাপসিবল গেট। ভেতরে শুকনো বারান্দা, দরজা জানলা সব বন্ধ। চারপাশে গাছপালার ফাঁকে বৃষ্টি ঝরার জন্যে ঝাঁঝরি লাগান জলের পাইপ লুকোনো রয়েছে। বানভাসি গ্রামের সমস্ত মানুষ কোলাপসিবল গেটের ওপর একমাত্র আশ্রয়ের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ছে। অঝোর ধারায় বৃষ্টি। সঙ্গে বড় বড় পাখা লাগিয়ে দমকা হাওয়ার ঝাপটা। ওয়েল্ডিং করার ইলেকট্রোড দিয়ে চিড়িক চিড়িক বিদ্যুৎ চমকে উঠছে। নায়িকা জবজবে ভিজে। জল ভেঙে সিঁড়ির কাছাকাছি এসে, আবার ফিরে বাচ্চাটাকে কোলে করে নিয়ে যাবে – এই মোটামুটি দৃশ্য। এমনিতেই নায়িকা ভিজে কাদা। তার ওপর দু একবার রিহার্সাল, মনিটর করে একেবারে নেতিয়ে রয়েছেন। আলো, রিফ্লেকটর ইত্যাদি ঠিক করার সময় যদিও নায়িকা একটা বড় তোয়ালে জড়িয়ে রয়েছেন, কিন্তু সে তোয়ালেও ভিজে। এক হাতের দূরত্বে সচক্ষে দেখেছি নায়িকাকে থিরথির করে ঠান্ডায় কাঁপতে। তারপরেও দু-একটা শট বাতিল হবার পর O.K. হল। রাত তখন ঠিক এগারোটা। সেদিন ভোর তিনটে পর্যন্ত উনি শট দিয়েছেন স্টুডিওতে। তারপর ছ'টায় প্লেন ধরে বম্বে। সেখানে ন'টায় অন্য ছবির শুটিং। ভাবতে পারেন কী অমানুষিক পরিশ্রম! নায়িকার নাম স্মিতা পাতিল। আর ছবির নাম দেবশিশু। পরিচালক উৎপলেন্দুকে জিগ্যেস করে মেপে দেখতে পারেন আমি কত কম লিখেছি। □

তরুণ দাস

ফটো : অর্ধেন্দু রায়

খেলা

শীতের খেলা উইন্টার ওলিম্পিকস

শীতের আমেজই আলাদা। শীতের দুপুরের হালকা রোদে বসে ইডেন গার্ডেনে টেস্ট ক্রিকেট দেখারও মেজাজ একেবারেই ভিন্ন। তবে শীতের এই আমেজ নেহাতই আমাদের দেশের মত নাতিশীতোষ্ণ দেশেই পাওয়া সম্ভব শীতপ্রধান দেশগুলিতে কিন্তু শীতকালটা খুবই কষ্টের। সাইবেরিয়া বা স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলিতে শীতের সময় কেবলই বরফ। সেই সময় কোন খেলা হলে তা বরফের ওপরই হওয়ার কথা। এরকম অনেকগুলি খেলাই এই সমস্ত দেশে প্রচলিত। আর সেই বরফের ওপরের খেলাগুলি নিয়েই প্রতি চার বছর অন্তর অনুষ্ঠিত হয় শীতকালীন ওলিম্পিক্স।

এই শীতকালীন ওলিম্পিক্স হয় সে বছরই যেবার গ্রীষ্মকালীন ওলিম্পিক্সও হয়। এবছর যেমন দক্ষিণ কোরিয়ায় হল গ্রীষ্মকালীন ওলিম্পিক্স, শীতকালীন ওলিম্পিক্স হয়েছে ইউরোপের যুগোশ্লাভিয়ায়। ১৯২৪ সালে শীতকালীন ওলিম্পিক্সের শুরু। প্রথম দিকে একই দেশে দুটি ওলিম্পিক্সই অনুষ্ঠিত করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কারণে তা শেষ পর্যন্ত অব্যাহত রাখা সম্ভব হয়নি। প্রধান কারণ অবশ্যই স্বাভাবিক বরফ সমস্ত দেশে তো পাওয়া যায় না। যেমন ১৯২৮ সালের গ্রীষ্মকালীন ওলিম্পিক্স হয় নেদারল্যান্ডসের আমস্টার্ডামে। আমস্টার্ডাম চেষ্টা চরিত্র করে বরফের ইনডোর স্কেটিং রিঙ্ক নিশ্চয়ই তৈরি করতে পারত, কিন্তু স্কিইংয়ের জন্য যে উন্মুক্ত বরফে ঢাকা জমি দরকার তা কোথায় পাবে আমস্টার্ডাম বা নেদারল্যান্ডস। ফলে সেবারের শীতকালীন গেমস হয় সুইজারল্যান্ডের সেন্ট মরিজে।

অবশ্য ১৯২৪ সালের প্রথম শীতকালীন গেমস, ১৯৩২ সালের তৃতীয় ও ১৯৩৬ সালের বার্লিন গেমসের সঙ্গে সেই দেশেই সেবারের শীতকালীন গেমস হয়েছে।

প্রথম সরকারি শীতকালীন গেমসের আগেও শীতকালীন খেলাধূলার আসর বসত। তবে সেগুলি মূলত স্ক্যান্ডিনেভিয়ার দেশগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯০১ থেকে ১৯১৭ সালের মধ্যে প্রতি চার বছরে একবার করে এবং ১৯২২ ও ১৯২৬ সালে নর্ডিক গেমস হয়। এই প্রতিযোগিতায় যে সমস্ত খেলাগুলি অনুষ্ঠিত হয় সেগুলি হল – নর্ডিক স্কিইং (ক্রস কান্ট্রি স্কিইং), স্কি জাম্পিং ও ব্যান্ডি। ব্যান্ডি হল আইস হকির মত একটি খেলা।

এই সমস্ত খেলা এবং আরো বিচিত্র কিছু ছোট ছোট প্রতিযোগিতাকে ঘিরে ইউরোপের নরওয়ে দেশের মানুষ মেতে উঠতেন বার্ষিক হোমেনকোলেন (Holmenkollen) সপ্তাহে। নরওয়ে ও স্ক্যান্ডিনেভিয়ার বাকি দেশগুলির মানুষ এই এক সপ্তাহ কেবল মেতেই উঠতেন না, প্রতিযোগিতা হত গ্রীষ্মকালীন ওলিম্পিক্সের মতই। এই হোমেনকোলেন সপ্তাহ যেন ক্রমশ খেলার থেকেও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মত আকার ধারণ করছিল। এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করা যেন তীর্থ ভ্রমণের শামিল হয়ে পড়ছিল। ডাউনহিল স্কি রেসিং ও স্ল্যালমের স্রষ্টা স্যার আর্নল্ড লান শীতকালীন খেলাধূলার সেরা যোদ্ধাদের একজন। হোমেনকোলেন সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। – 'হোমেনকোলেন সম্পর্কে কিছু ভালভাবে বলতে গেলে আমার সব সময়েই মনে হয়েছে যে

ইরিনা রডনিনা ও আলেক্সেই উলানভ – ১৯৭২ গেমসে সোভিয়েত ইউনিয়নের সোনা জয়ী ফিগার স্কেটিং জুড়ি





নরওয়ের ফিল্ম স্টার ফিগার স্কেটার সোনিয়া হেনি

একটা কিছু রহস্য আছে ওখানে। অনেকটা সেই পুরনো ওলিম্পিক্সের মত।'

আধুনিক ওলিম্পিক্সের জন্মদাতা ব্যারন পিয়ের দ্য কুবার্ত যেমন গ্রীষ্মকালীন ওলিম্পিক্সের সংগে শীতকালীন ওলিম্পিক্সের আয়োজন সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন নরওয়ের মানুষও তেমনি একটা ধারণা পোষণ করতেন যে শীতকালীন ক্রীড়া একমাত্র নরওয়েতেই হতে পারে এবং এই হোমেনকোলেন সপ্তাহেই তা হওয়া সম্ভব এই দুটি ব্যাপারই শীতকালীন ওলিম্পিক্সের জন্ম হওয়ার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

লন্ডনে ১৯০৮ সালের গ্রীষ্মকালীন ওলিম্পিক্সে ফিগার স্কেটিং অন্তর্ভুক্ত হয়। তারপরই স্যার আর্থার লানের বাবা হেনরি লানের উদ্যোগে যখন আলপাইন প্যাকেজ ট্যুর শুরু হয় তখন শীতকালীন এই খেলাগুলি ক্রমশ জনপ্রিয়তা পেতে শুরু করে। এই সমস্ত খেলাগুলির ওপর স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলির আধিপত্যও এর সংগে কমে যায়। ১৯১৪ সাল নাগাদ স্ক্যান্ডিনেভিয়ার বাইরেও খেলাগুলি বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। সে বছরই প্যারিসে ওলিম্পিক কংগ্রেসে শীতকালীন গেমস করার জন্য জোরদার দাবি ওঠে। আর এবার নরওয়েও এই দাবিকে সমর্থন জানায়।

পরবর্তী গ্রীষ্মকালীন ওলিম্পিক্স হয় ১৯২০ সালে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর। এটি হয় আন্টওয়ার্পে। এখানে কিন্তু প্রথম শীতকালীন ক্রীড়া শেষ পর্যন্ত হতে পারেনি। তবে স্কেটিং ও আইস হকি খেলা দুটি গ্রীষ্মকালীন ওলিম্পিক্সের অন্যতম খেলা হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

শীতকালীন ক্রীড়ার ইতিহাসের সবচেয়ে গৌরবজনক ও উল্লেখযোগ্য অধ্যায় ১৯২৪ সালের বছরটি। সেবার গ্রীষ্মকালীন ওলিম্পিক্স হয় ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে। ফ্রান্সেরই বরফে ঢাকা শহর শামোনিক্সে ইন্টারন্যাশনাল উইন্টার স্পোর্টস উইকের আয়োজন করা হয় ইন্টারন্যাশনাল ওলিম্পিক কমিটির (আই ও এ) উৎসাহে। দু বছর পর এই প্রতিযোগিতাটিকেই প্রথম শীতকালীন গেমসের খেতাব দেওয়া হয়। আর ওই প্রতিযোগিতা চলাকালীনই প্রথমবারের জন্য শীতকালীন খেলাধূলাকে ঘিরে কোন একটি সমিতি গড়া হয় – ফেডারেশন ইন্টারন্যাশনেল দ্য স্কিইং (এফ আই এস)।

শীতকালীন ক্রীড়াকে ওলিম্পিক মুভমেন্টের পরিপন্থী বলে ব্যারন কুবার্ত সব সময়েই অভিহিত করেছেন। তাঁর কথার সম্মান রাখতেই যেন ১৯৩৫ সাল থেকে আই ও সি এবং এফ আই এস-এর মধ্যে বিরোধ দানা বাঁধতে শুরু করে। প্রসংগত বলে রাখা দরকার, ১৯২৫ সালের ২৭ মে শীতকালীন গেমসের একটি চার্টার তৈরি হয় এবং তা আই ও সি মেনেও নেয়। এটিতে বলা হয় – আই ও সি প্রতি গ্রীষ্মকালীন ওলিম্পিক্সের বছরে ওলিম্পিক শীতকালীন গেমস করবে এবং সেগুলিকে যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় শীতকালীন গেমস নামে বলা হবে। আর এগুলি গ্রীষ্মকালীন ওলিম্পিক্সের সমস্ত নিয়ম ও রীতি মেনে চলবে। পুরস্কার, মেডাল ও ডিপ্লোমাগুলি গ্রীষ্মকালীন গেমসের থেকে অন্যরকম হবে। এই গেমসের ক্ষেত্রে 'ওলিম্পিয়াড' ব্যবহৃত হবে না। গেমসের স্থান নির্ণয়ের ভার আই ও সি-রই। তবে সে বছরের গ্রীষ্মকালীন গেমস যে দেশ করবে তাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

সুতরাং গ্রীষ্মকালীন গেমসের মত এক্ষেত্রেও পেশাদারদের প্রবেশ নিষেধ রইল। এদিকে এফ আই এস-এর নিয়মে শিক্ষকরা পেশাদার নন। অথচ আই ও সি সিদ্ধান্ত নিল যে শিক্ষকদের শীতকালীন গেমসে যোগ দিতে দেওয়া হবে না। কিন্তু ১৯৩৬ সালের জার্মিন-পার্টেন কিরশেন গেমসে একটি জার্মান

দলকে খেলতে দেখা গেল যারা অন্যান্য দেশের শিক্ষকদের থেকে অনেক বেশি পেশাদার ও অনেক বেশিদিন ধরে প্রশিক্ষণ নিয়ে এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছেন। আই ও সি-র এই বিপরীতধর্মী নিয়মের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে এফ আই এস ঘোষণা করল যে স্কি শিক্ষকদের যোগ দিতে না দিলে তারা পরবর্তী গেমসগুলি বর্জন করবে। শেষ পর্যন্ত ফল ফলল এবং দু বছর পর থেকে শিক্ষকদেরও যোগ দিতে দেওয়া হল। তবে দু বছর পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। ১৯৪৮-এর আগে আর কোন গেমসই হল না।

যুদ্ধ পরবর্তীকালে শীতকালীন ক্রীড়ার অগ্রগতির প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ালেন তৎকালীন আই ও সি সভাপতি আভেরি ব্রান্ডেজ। তিনি সব সময়েই স্কিইংয়ের পেশাদারীর দিকটার কথা নিয়ে সোচ্চার হতেন। বিজ্ঞাপন ও অনুশীলনের জন্য অত্যধিক সময় নেওয়া – এই দুটি বিষয়ে তখন আই ও সি এবং এফ আই এস-এর মধ্যে বিরোধটা ওঠে তুংগে। ১৯৬৮ সালে গ্রেনোবল গেমসের ঘটনাটি একে পৌঁছে দেয় চরমে। ব্রান্ডেজ জানতেন যে স্কিয়াররা তাঁদের স্কি-র ওপর কোন বিজ্ঞাপন প্রদর্শন করবেন না। কিন্তু শেষ মুহূর্তে তিনি আবিষ্কার করেন ঠিক সেটাই হচ্ছে। আর সেই সমস্ত সরঞ্জামগুলি না পাল্টিয়েই শেষ পর্যন্ত প্রতিযোগিতাগুলি অনুষ্ঠিত হয়। এর চার বছর পরে সাপ্পোরোতে ব্রান্ডেজ অস্ট্রিয়ার স্কিয়ার কার্ল শ্রাঞ্জকে ডিসকোয়ালিফাই করে দেন। কারণ, কার্ল নিজেই বলে বেড়াচ্ছিলেন তিনি নাকি স্কিইং থেকে হাজার হাজার টাকা পাচ্ছিলেন। এ ঘটনা ২০ বছর পরে হলে হয়ত তেমন কোন হেডলাইনই হত না। এখন তো ওলিম্পিক্সে পেশাদারদের প্রবেশ বেশ ভালভাবেই হয়ে গেছে। আর কিছুদিনের মধ্যে পেশাদার-অপেশাদার ভাগটাই হয়ত থাকবে না।

যাই হোক, একটা ব্যাপার বেশ পরিষ্কার। শীতকালীন খেলাধূলাকে বিশ্বের খেলাধূলার মানচিত্রে জায়গা করে নিতে বেশ কষ্ট করতে হয়েছে এবং এখনো সম্পূর্ণ জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি।

শীতকালীন ক্রীড়াগুলি জনপ্রিয়তা যাই অর্জন করুক না কেন এই খেলাগুলি দৃষ্টিনন্দন এবং রোমাঞ্চকর এতে সন্দেহ নেই। সাদা চকচকে তুলোট বরফের ওপর দিয়ে স্কি করে যখন প্রতিযোগীরা একের পর এক হুশ করে চোখের সামনে দিয়ে চলে যান তখন শরীরে এক অদ্ভুত রোমাঞ্চ জাগবেই। আর এই রোমাঞ্চকর খেলাগুলিতে মেয়েরাও পিছিয়ে নেই। তাঁরাও বেশ স্বতঃস্ফূর্তভাবেই এগিয়ে এসেছেন এই চোখজোড়ানো খেলাগুলিকে জনপ্রিয় করতে। শীতকালীন ওলিম্পিক্সের গোড়া থেকে বেশ কিছু মেয়ে এই আসর মাতিয়েছেন। এঁদের কয়েকজনের কথা দিয়েই লেখাটি শেষ করি।

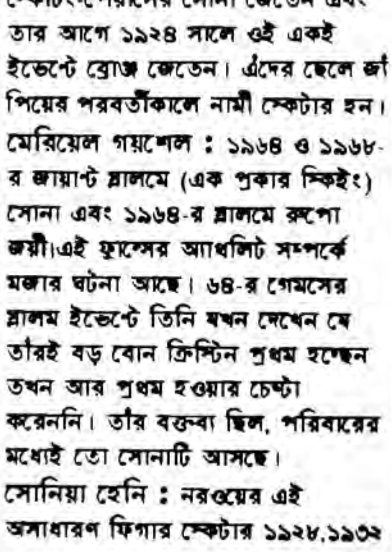
ক্লডিয়া বোয়ার্সকিখ : ৬০-এর দশকের সোভিয়েতের এই অন্যতম সেরা মেয়ে স্কিয়ার স্বদেশে ফিজিক্যাল এডুকেশনের শিক্ষকও ছিলেন। ১৯৬৪-র শীতকালীন গেমসে ৫ কিলোমিটার, ১০ কিলোমিটার ও ৩×৫ কি মি রিলে স্কিইংয়ে সোনা জেতেন।

আন্দ্রি জলি ব্রুনেট : স্বামী পিয়ের ব্রুনেটের সংগে জুটি বেঁধে ফ্রান্সের এই মেয়ে ১৯২৮ ও ১৯৩২ সালের ফিগার স্কেটিং-পেয়ার্সের সোনা জেতেন এবং তার আগে ১৯২৪ সালে ওই একই ইভেন্টে ব্রোঞ্জ জেতেন। এঁদের ছেলে জাঁ পিয়ের পরবর্তীকালে নামী স্কেটার হন।

মেরিয়েল গয়শেল : ১৯৬৪ ও ১৯৬৮-র জায়ান্ট স্লালমে (এক প্রকার স্কিইং) সোনা এবং ১৯৬৪-র স্লালমে রুপো জয়ী।এই ফ্রান্সের অ্যাথলিট সম্পর্কে মজার ঘটনা আছে। ৬৪-র গেমসের স্লালম ইভেন্টে তিনি যখন দেখেন যে তাঁরই বড় বোন ক্রিস্টিন প্রথম হচ্ছেন তখন আর প্রথম হওয়ার চেষ্টা করেননি। তাঁর বক্তব্য ছিল, পরিবারের মধ্যেই তো সোনাটি আসছে।

সোনিয়া হেনি : নরওয়ের এই অসাধারণ ফিগার স্কেটার ১৯২৮,১৯৩২ ও ১৯৩৬ গেমসের ফিগার স্কেটিংয়ের সোনাগুলি জেতেন। কিন্তু তাঁর জনপ্রিয়তা ফিগার স্কেটিংয়েই সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি পরবর্তীকালে তাঁর প্রতিভার বিকাশ ঘটান চিত্রজগতে এবং অনেকগুলি ছবি করে বিশ্বে প্রভূত নাম কেনেন।

লুডমিলা ও ওলেগ প্রোটোপোপভ – ৬৪ ও ৬৮-র ফিগার স্কেটিং চ্যাম্পিয়ন



গালিনা কুলাকোভা : সোভিয়েত ইউনিয়নের আরেকজন সেরা মেয়ে স্কিয়ার যিনি ১৯৭২ গেমসে ৫ কিমি, ১০ কিমি ও ৩×৫ কিমি রিলে এবং ১৯৭৬ গেমসে ৩×৫ কিমি রিলে স্কিইংয়ে সোনা জেতেন। এছাড়া রুপো জেতেন ১৯৬৮-র গেমসে ৫ কিমিতে এবং ব্রোঞ্জ জেতেন ১৯৬৮-র ৩×৫ কিমি রিলে ও ১৯৬৭-এর ১০ কিমি স্কিইংয়ে। ইনিও ফিজিক্যাল এডুকেশনের একজন শিক্ষক।

রোসি মিটারমেয়ার : পশ্চিম জার্মানির এই মেয়েটি প্রথম যিনি একটি গেমসের অ্যালপাইন স্কিইংয়ের তিনটি ইভেন্টের মধ্যে দুটি সোনা ও একটি রুপো জেতেন। তিনি ১৯৭৬ গেমসের ডাউনহিল ও স্লালমে সোনা এবং জায়ান্ট স্লালমে রুপো জেতেন।

মারি-থেরেস নাদিগ : হঠাৎ যেন কোথা থেকে উড়ে এসে সুইজারল্যান্ডের এই মেয়েটি ১৯৭২ গেমসের ডাউনহিল ও জায়ান্ট স্লালমের সোনা দুটি জিতে নেন। অথচ ১৯৭১ সালে নাদিগের নামও বিশেষ কেউ জানতেন না।

লুডমিলা বেলুসোভা প্রোটোপোপভ : স্বামী ওলেগ প্রোটোপোপভকে সংগী করে সোভিয়েত ইউনিয়নের এই মেয়ে ফিগার স্কেটিংয়ে পর পর ১৯৬৪ ও ১৯৬৮ গেমসের সোনা জেতেন। পরবর্তীকালে তাঁরা পেশাদার হয়ে যান এবং টোকিওতে প্রচুর পুরস্কার অর্থের একটি প্রতিযোগিতা জেতেন ১৯৭৩ সালে।

লিডিয়া স্কোবলিকোভা : ১৯৬০ সালে আইস স্পিড স্কেটিং গেমসে অন্তর্ভুক্তি পাওয়ার পর ১৯৬৪ গেমসের স্পিড স্কেটিংয়ের প্রতিটি সোনা জেতেন এই সোভিয়েত মেয়ে। সেবার তিনি জেতেন ৫০০ মি, ১৫০০ মি ও ৩০০০ মি-এর সোনা। এছাড়া ১৯৬০ সালে তিনি সোনা জেতেন ১৫০০ মি ও ৩০০০ মি-এ।

অনিরুদ্ধ ঘোষ

কেনাকাটা

শীতের সবজি : বেহাল চাষীর কিস্‌সা

প্রবাদ আছে 'মেছো বাঙালি'। ভাতের সঙ্গে মাছের সম্পর্ক ওতপ্রোত। কিন্তু শুধু মাছ দিয়েই কি রসনা তৃপ্ত হয়? না, তা হয় না। মাছের পদের আগেই দরকার সবজির নানান পদ। আর সেই পদ হওয়া উচিত ঋতুর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। যেমন ধরুন, শীতের দিনে শীতের সবজি, বর্ষার দিনে বর্ষার সবজি। আর তা না হলেই বাঙালিবাবুর মন যায় বিগড়ে। বিগড়ে যান বাঙালি গিন্নিও।

শীতের দিনে শীতের সবজি না হলে কী পাতে দেবেন রাঁধুনি?

গোস্বামীবাবু বাজার আনতেই ঠানদিদি কুটতে কুটতে গল্প শুরু করেন। পাশে তাঁর নাতি-নাতনীরা বসে। 'সেকালে ফুলকপি ইয়া ইয়া বড় করে কেটে কতকিছুর পদই না করতাম। শুধু কি ফুলকপির পদ? শীতকালীন সবজির নানা পদ রান্নার সময় গন্ধে পাড়া ম-ম করত। কিন্তু শীতের

সবজি নিজের ছেলের মুখে তুলে দিতে পারেন না ছবি দেবী। হাওড়া ব্রিজ অ্যাপ্রোচ রোডের ধারে বসে বছরের বেশিরভাগ সময়েই সবজি বিক্রি করে সংসার চালান ছবি দেবী। কথায় কথায় বললেন, 'আমি নিজে সবজি বিক্রি করি। কিন্তু আমি অসহায়। ব্যবসার ক্ষতির কথা ভেবে বাছার মুখে দুটো পাতা তুলে দিতে পারি না।'

উপায়ান্তর পান না যাঁরা, এই সবজি চাষ করেন সেই সমস্ত চাষীরা। হুগলি জেলার তারকেশ্বর, আরামবাগ, হরিণখোলা নদীর উভয় তীর, দামোদর নদীর অববাহিকা, মেদিনীপুরের ঘাটাল, দাসপুর, কংসাবতীর উভয় তীর ও ২৪ পরগনার ক্যানিং প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে শীতকালীন সবজির চাষ হয়ে থাকে। কিন্তু শীতকালে যেমন বৎসরের অন্যান্য সময়ের চেয়ে বেশি সবজি চাষ হয়ে থাকে, তেমনি একমাত্র দামোদর নদীর অববাহিকা ও তারকেশ্বর নদীর পার্শ্ববর্তী এলাকা ছাড়া অন্যান্য অঞ্চলে সবজি চাষের সমস্যা দেখা দেয় সেচের জলের অভাবে। ফলে শীতকালীন সবজি চাষ করেও তাঁরা ধন্দে পড়ে যান কী করবেন।

এছাড়া, শীতকালীন সবজি চাষীদের আরও একটি প্রধান সমস্যা হল ফোড়েদের হাতে মার খাওয়া। সাগরপুর, দাসপুর, কলমীজোড়, ক্যানিং, ঠাকুরানীচক ও বর্ধমানের ভাতার গ্রামের চাষীরা গ্রামের বাজারে সবজি বিক্রি করে নির্দিষ্ট মূল্যের বাজার পান না। ঐসব বাজারে ফোড়েরা যা দাম দেয় সেই দামেই জিনিস বিক্রি করতে হয়। অথচ ঐ দামে কেনা সবজি



ফোড়েরা শহরে চালান দিয়ে দ্বিগুণ মুনাফা লোটে। এদিকে দাম কম পাবার জন্য চাষীরা বেশিরভাগ সময়েই সার ও বীজের দামই তুলতে পারে না। তাই ভাতে মরতে হয় তাদের।

শুধু শীতকালীন সবজি কেন, শীতকালীন ফল দিয়েও আহারের ব্যবস্থা করা যায়। ছেলেকে স্কুলে পাঠিয়ে এলোচুলে, রোদপিঠ করে কমলামাসি স্কোয়াশে কামড় দিতে দিতে মেয়ে চুনিকে বোঝাচ্ছিলেন কীভাবে শীতের কমলালেবু, আপেল টম্যাটো, ধনেপাতা ও শীতে ওঠা শশা দিয়ে স্যালাড বানাতে হয়। কিন্তু সাত সকালে স্যালাডের বাজার করতে গিয়ে আচার হয়ে যায় মেসোমশায়। ছট পুজোর পর কলার দাম যে হারে বেড়েছে তাতে করে মাকন্দ খোসায় পা পিছলে পড়ে যাওয়ার অবস্থা। কাশ্মীরি কমলালেবু তিন থেকে সাড়ে তিন টাকার কমে পাওয়া যায় না। আপেল দশ থেকে বার টাকা কিলোর নিচে পাওয়া যায় না। বাজারে যে নতুন রাঙা-আলু ও শাকালু উঠেছে তাতেও হাত দেওয়া দায়।

সবজির বাজারের মত ফলের বাজারেরও এই হাল কেন? জিগ্যেস করলাম চিৎপুরের ফল ব্যবসায়ী গুরজিৎ সিংকে। সিংজী জানালেন, 'ইদানীং ফলের চাহিদা বেড়েছে সত্যি, কিন্তু সে তুলনায় যোগান কম। তাছাড়া ক্যারিং কস্ট বাড়ছে দিন দিন। তাই সব চাপটা পড়ে খদ্দেরের ওপর। বিলেতি কুলের বাজার এখন তেমন পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু দেশি কুল বা কয়েতবেলের দামও কি খুব কম? শুধু ফলের মধ্যে আখ আর শশার বাজারটাই যা একটু ভাল।

ফিরছিলাম সন্ধ্যাবেলা। শুনতে পেলাম সেই ঠানদিদিমার কণ্ঠস্বর। শীতের সন্ধ্যায় জমিয়ে বসে গল্প শুরু করেছেন নাতি-নাতনীদের সঙ্গে।

শীতের নানান সবজি নিয়ে কত রকমের যে পিঠেপুলি বানাতেন তা বোঝাচ্ছেন।

কথা বলতে বলতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়ে নাতি-নাতনীরা কেউ বুঝতে পারে না। ঠানদিদি একা বসে বসে সেই পুরনো দিনের শীতের রান্নার স্মৃতি রোমন্থন করেন। □

শিবরাম চক্রবর্তী

ফটো : অভিজিৎ দাস

শিল্প সংস্কৃতি

সিনেমা

অঞ্জনবাবুর ইচ্ছায় অঞ্জলি



মায়ের ইচ্ছা থাকলে সব কিছুই সম্ভব হয়। পংগুও পাহাড় টপকাতে পারে, অন্ধও দৃষ্টি ফিরে পেতে পারে। সে কথা মনে রেখেই বোধহয় অঞ্জন চৌধুরী অবাস্তব কাহিনী আর দুর্বলচিত্রনাট্য নিয়েও 'অঞ্জলি' ছবি তৈরি করেছেন। কিন্তু দর্শকদের না দেখার ইচ্ছা যদি প্রবল হয় তাহলে শুধু মায়ের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে 'অঞ্জলি' কতটা বক্স অফিসের দাক্ষিণ্য পাবে বলা মুশকিল।

বাঙালি যেহেতু ঈশ্বর বিশ্বাসী, তাই বোধ হয় অঞ্জনবাবু ছবি শুরু করেছেন দক্ষিণেশ্বরের মন্দির থেকে। গল্পের নায়ককে করেছেন (জর্জ বেকার) মা কালীর মহিমা প্রচারক, সংসারত্যাগী যুবক। তিনি খালি গান গেয়ে, হাত জোড় করে মায়ের মহিমা প্রচার করেন। কোন কাজ-কম্ম নেই অথচ সুন্দর বেশবাস, রোজ দাড়ি কেটে গাল চকচকে রাখেন। মন্দিরেই আলাপ বিরাট ধনী ব্যবসায়ী কালী ব্যানার্জির সংগে। কালী ব্যানার্জির অনুরোধে নায়ক (জর্জ বেকার) বাড়িতে আসেন। আলাপ হয় ধনী কন্যা মুনমুনের সংগে। গল্পের খাতিরে তিনি ঘোরতর নাস্তিক এবং বিলাস-বহুল জীবনে অভ্যস্ত। সবসময় সংগী কুকুর বিটুকে নিয়ে থাকতে ভালবাসেন। সৌমিত্র ব্যানার্জির সংগে মুনমুনের বিয়ের সব ঠিকঠাক। কিন্তু দেনা-পাওনা নিয়ে বিয়ের দিন অশান্তি হয়। ফলে বিয়ে ভেস্তে যায়। বাবার মান বাঁচাতে মুনমুনকে বিয়ে করতে হয় জর্জ বেকারকে। মুনমুন মন থেকে কিছুতেই এ বিয়ে মানতে পারেন না। ফুলশয্যার রাত্রে তাই কুকুরকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাকেন নায়িকা (বাংলা ছবিতে অঞ্জনবাবুই বোধহয় নতুন যাত্রা যোগ করলেন) আর নায়ক থাকেন বাইরের বারান্দায়। শুরু হয় সংঘাত। মুনমুন চলে যান চা বাগানে। সেখানে চা-বাগানের ম্যানেজার রঞ্জিত মল্লিকের প্রেমে পড়ে যান। এদিকে কালী ব্যানার্জি তাঁর সব সম্পত্তি জামাই-এর (জর্জ বেকার) নামে লিখে দেন। পিতা-পুত্রীর মধ্যে শুরু হয় অশান্তি। নাটকীয় ভাবে পিতার সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হয়। নানাভাবে জর্জ বেকারকে অপমান করতে থাকেন মুনমুন। কিন্তু জর্জ বেকারও হাল ছাড়েন না। হাত জোড় করে সবই মায়ের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিয়ে তিনি মুখ বুজে সব সহ্য করে যান। এরপর চলে নানা আজগুবি, বোকা বোকা ঘটনা। ছবির শেষে অবশ্য মুনমুনকে হার স্বীকার করে নিতে হয় জর্জ বেকারের কাছে। মায়ের পায়ে অঞ্জলি দেন তিনি। মিল হয় দুজনের।

অঞ্জনবাবু ছবির শুরু করেছিলেন দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে। শেষ করলেন মা কালীর পায়ে ফুল দিয়ে, সেই মন্দিরেই। ছবিতে 'মায়ের আশীর্বাদ' বরাবরই পেয়ে এসেছে 'বম্বের কুকুর' বিটু। এই কুকুরটাকে দিয়ে অঞ্জনবাবু বাংলায় সংলাপ বলানো ছাড়া আর সবই করিয়েছেন। 'মায়ের আশীর্বাদ' ধন্য এরকম একটি কুকুর পেলে আমাদের পুলিশ ডিপার্টমেণ্টের অনেক সুবিধা হয়। ছবির শেষে মারপিটের দৃশ্য খুব হাস্যকর। বেঢপ চেহারা নিয়ে রঞ্জিত মল্লিক (যে এক লাফে জীপে উঠতে পারে না) সৌমিত্র ব্যানার্জি সহ চারপাঁচ জনকে বেদম পিটিয়ে যেভাবে মুনমুনকে উদ্ধার করলেন তা একেবারে অসহ্য। এরকম অসহ্য দৃশ্য আর কতকাল দর্শকদের দেখতে হবে?

অনুপ জালোটার কণ্ঠে গানগুলি শ্রুতিমধুর। শেষ দৃশ্যে বনশ্রী সেনগুপ্তর গাওয়া 'তোর চরণ ছুঁয়ে...... গানটি দর্শকদের একটু স্বস্তি দেবে।

অতীশ ঠাকুর

নাটক

সুস্থ পারিবারিক নাটক তনয়া



ফটো : অরুণ চট্টোপাধ্যায়

ঠিক এখনই কলকাতার পেশাদারি মঞ্চে আশাপূর্ণা দেবীর কাহিনী-আশ্রিত নাটক 'তনয়া' চলছে। মূলকাহিনীকে মোটামুটি অক্ষুণ্ণ রেখে তপেন্দু

গঙ্গোপাধ্যায় নাটকটিকে গেঁথেছেন। গড়ে তুলেছেন সতি মায়ের দ্বন্দ্ব, সতি পিতার দ্বন্দ্ব। একটি পারিবারিক জটিলতাকে অনায়াসে বিশ্লেষণ করেছেন, সঠিক চরিত্রায়ণে। একজন ভাল অভিনেতার অভিনয় দেখা একালে প্রায় হয়ে ওঠে না। পরিচালকের কৃতিত্ব পুরো নাটকে তিনি নাটকই রেখেছেন। সিনেমা বা যাত্রার সঙ্গে নাট্যাভিনয়ের পার্থক্যটা বুঝে নেওয়া যায় স্বয়ং দিলীপ রায়ের অভিনয়ে। নাটকের মূল কাহিনী গড়ে উঠেছে একটি মায়ের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-স্বপ্ন-ভালবাসাকে কেন্দ্র করে। নাটকে এই মা রাজেশ্বরী রায়চৌধুরী। বলতে দ্বিধা নেই, রাজেশ্বরী অনেক পরিণত অভিনয় করেছেন। প্রতিটি দৃশ্যে তিনি মূর্ত হয়ে উঠেছেন। পাশাপাশি মেয়ের ভূমিকায় সোমা চট্টোপাধ্যায় এখনও আড়ষ্টতা কাটাতে পারেননি। অনামিকা সাহা এ নাটকে তাঁর ভূমিকা দিলীপ রায়ের বৌদি অর্থাৎ রাজেশ্বরীর বড় জা। অনামিকা ভাল অভিনেত্রী আবার প্রমাণিত হল। কিন্তু কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে উচ্ছসিত হওয়ার কিছু নেই। কৌশিক মঞ্চকে ব্যবহার করতে জানেন বটে, কিন্তু কোথাও কোথাও অতি অভিনয়ের ঝোঁক নাটকের তালভঙ্গ করে। পেশাদারি মঞ্চে শ্রীরূপ মিত্র একটি প্রচারিত নাম। সে নাম অক্ষুণ্ণই রয়েছে। আর দেবরাজ রায় : তনয়া নাটকে বিবেকের কাজ করেছেন তিনি। দেবরাজ কত বুদ্ধিমান ও শক্তিমান অভিনেতা, তা তনয়া দেখলেই বোঝা যায়। অন্যান্য অভিনেতা-অভিনেত্রীরা পরিচালককে অনুসরণ করেছেন যথাযথ। নাটককে গতি দিতে এঁরা সকলেই সমান আগ্রহী। দেবাশিস দাশগুপ্ত এ নাটকের সংগীত পরিচালক। গ্রুপ থিয়েটারে সংগীত রচনাকার হিসেবে দেবাশিসবাবুর কাছে একটু বেশিই আশা করেছিলাম – পেলাম না। সুরারোপ তেমনভাবে টানল না। বরং 'আমরা এই বিশ্বের বুকে গড়ব রঙমহল' – গানটি সুপ্রযুক্ত। তনয়া পেশাদারি মঞ্চে সমস্ত গতানুগতিকতার বাইরে সুস্থ, পারিবারিক এবং মনোরম উপভোগ্য নাটক হয়ে উঠতে পেরেছে। এ নাটক দেখতে গিয়ে বাবা মেয়েকে নিয়ে, মা ছেলেকে নিয়ে, ভাই বোনকে নিয়ে অস্বস্তিতে পড়বেন না, এটাই স্বস্তির।

সৈনিক রায়

বিবিধ

রূপমঞ্জরীর নজরুল সন্ধ্যা



সম্প্রতি রূপমঞ্জরীর দ্বাদশ বার্ষিক সংগীত সন্ধ্যা উদ্‌যাপিত হয় রবীন্দ্রসদন প্রেক্ষাগৃহে। অনুষ্ঠান শুরু হয় রূপমঞ্জরীর সমবেত সংগীত দিয়ে। দুটি গান। নজরুলগীতি। পরে সুতপা গুহের গান, বলতে দ্বিধা নেই, ভাল লাগেনি। গলাটিও শিল্পীর সব সময় সুরে বসেনি। শিল্পী কোনো গানেই তেমন স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেছেন বলে মনে হয়নি।

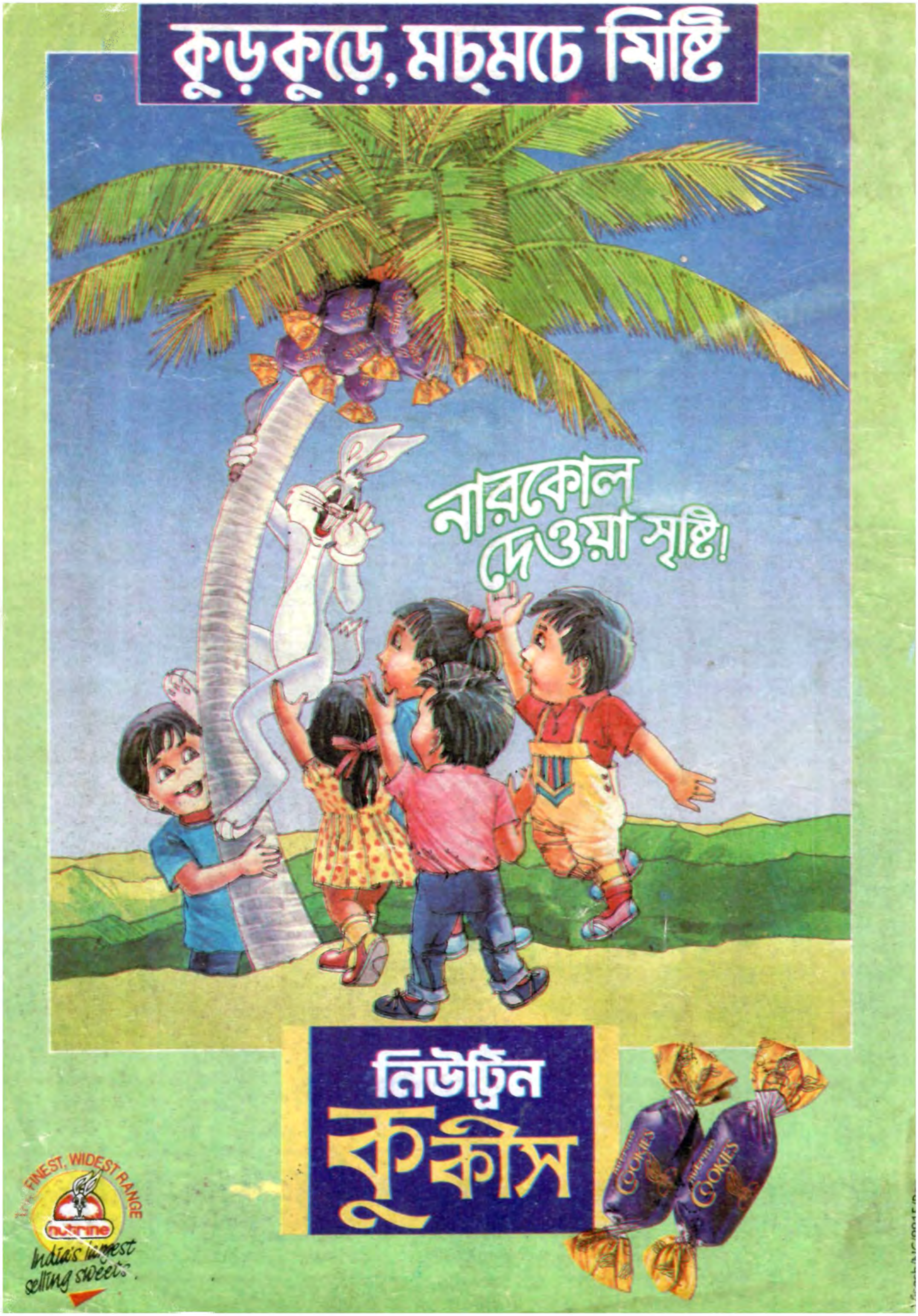
আবৃত্তিতে তরুণ চক্রবর্তী মাতিয়ে দিয়েছেন। তরুণ চক্রবর্তী প্রথমে পাঠ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের 'অঞ্জলি' কবিতাটি। অসম্ভব ভাল লেগেছে। তুলনায় বাঁশি মোটামুটি। এরপর নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর দুটি কবিতা। এর মধ্যে 'চিরুনী' কবিতাটি অনবদ্য। পরে স্বল্প দৈর্ঘ্যের দুটি কবিতা একটি শঙ্খ ঘোষের 'ভিড়', অন্যটি শক্তিনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'সিঁদুরের দাগ'। কবিতাটি যথেষ্ট দাগ কেটে গেছে।

ধীরেন বসু শোনালেন পরপর বেশ কয়েকটি নজরুলগীতি। নজরুলগীতিতে ধীরেন বসু পরিচিত নাম। সম্প্রতি বিদেশ প্রত্যাগত এই শিল্পী পরিশীলিত কণ্ঠে পরিবেশন করলেন যেসব গানগুলি তার মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় 'মনে পড়ে আজ সে কোন জনমে' গানটির। অসম্ভব দরদী, সুরেলা পরিবেশন। ভাল লেগেছে 'আমার গহীন জলের নদী' গানটিও। মনে থাকবে 'যেদিন লব বিদায়' গানটিও। ভাল না লাগা গানের তালিকায় রয়েছে 'তোমারই আঁখির মত' এবং 'চিরদিন কাহারো সমান নাহি যায়'। এই দুটি গানে শিল্পী ধীরেন বসু তেমন সাড়া জাগাতে পারেননি। পরিশেষে রূপমঞ্জরীর উদ্যোক্তাদের অজস্র ধন্যবাদ সুন্দর একটি সন্ধ্যা আমাদের উপহার দেওয়ার জন্য।

জ্যোতির্ময় রায়

সুকন্যা

শিল্প-উপদেষ্টা :
নিতাই ঘোষ
চিফ এগজিকিউটিভ,
বিপণন, বিজ্ঞাপন ও জনসংযোগ :
সি এইচ বসু, কলকাতা
সার্কুলেশন কন্ট্রোলার :
প্রসাদচন্দ্র দত্ত
সম্পাদকীয় দপ্তর ও
রেজি: অফিস :
ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড,
৩৩ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট,
কলকাতা ৭০০ ০৭২
ফোন : ২৭ ২১৬৯, ২৭-৯২৯২ ২৭
৯৩১১, ২৬ ১৬৮০, ২৬ ১৬৮৯,
Telex 021-5092 IPPL IN
দিল্লি অফিস :
সূর্যকিরণ বিল্ডিংস, ফ্ল্যাট ১২১২ ১৯
কস্তুরবা গান্ধী মার্গ,
নতুন দিল্লি ১১০ ০০১,
ফোন : ৩৩১-৭০২৪
জোনাল ম্যানেজার, নর্দার্ন জোন :
ওয়াই এ শেঠি, দিল্লি
জনসংযোগ :
শ্রীমতী গায়ত্রী রায়, দিল্লি
বোম্বাই প্রতিনিধি : ভি সত্যমূর্তি
বোম্বাই অফিস :
বিশাল বিজনেস সেণ্টার, ওয়ার্ডেন হাউস (দ্বিতল), স্যার পি এম রোড,
ফোর্ট, বোম্বাই ৪০০ ০০১
ফোন : ২৮ ৭২২৯৫, ২৮-৭২৩০৪,
২৮-৭১৩০৮
Grams VIBICENT
Telex 011-5726 AMSL-IN
ব্যাঙ্গালোর প্রতিনিধি :
সি আর ভরত
১০৯ এস জি ই এফ কলোনি রাজমহল বিলাস, এক্সটেনশন II স্টেজ,
ব্যাঙ্গালোর ৫৬০ ০৯৪
হায়দ্রাবাদ প্রতিনিধি
এস শঙ্করনারায়ণ
ফ্ল্যাট সি ৩ সঙ্গোসর কৃপা, ১ ১-৩০৮/সি ২, বাকারাম হায়দ্রাবাদ ৫০০ ০৮০ ফোন :
৯৬ ৭০০
মাদ্রাজ প্রতিনিধি :
পি এস রামমূর্তি
৩৭ পেরুমল স্ট্রিট, পুরুষাওয়াকম,
ফ্লাওয়ার্স রোড
পোস্ট, মাদ্রাজ ৬০০ ০৮৪, ফোন : ৬৬ ৪৭২১
মুদ্রাকর ও প্রকাশক দেবকুমার ব্যানার্জি কর্তৃক ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড প্রেস, ৭৭/২/১ লেনিন সরণি, কলকাতা ৭০০ ০১৩ (ফোন : ২৪ ০১৯৯) থেকে মুদ্রিত ও ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড, ৩৩ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে প্রকাশিত


কুড়কুড়ে, মচ্‌মচে মিষ্টি
নারকোল দেওয়া সৃষ্টি!
নিউট্রিন
কুকীস
THE FINEST, WIDEST RANGE
nutrine
India's largest selling sweets